৭|৭৪ C

ওঁ

পরমহংস শ্রীশ্রীবিশ্বনাথবাবার

(সংক্ষিপ্ত)

চরিতামৃত

LIBRARY
No....508...
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

স্বামী শিবানন্দ (শিববাবা)

ওঁ হর হর মহাদেব শম্ভো কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গে

মহাদেব শিব শঙ্কর শম্ভো উমাকান্ত হর ত্রিপুরারে।
মৃত্যুঞ্জয় বৃষভধ্বজ শুলিন্ গঙ্গাধর মৃড় মদনারে॥
শিব হর শঙ্কর গৌরীশম্ বন্দে গঙ্গাধরমীশম্।
রুদ্রং পশুপতিমীশানং কলিহর কাশীপুরীনাথম॥
জয় শম্ভো জয় শম্ভো শিব গৌরীশঙ্কর জয় শম্ভো।
জয় শম্ভো জয় শম্ভো শিব গৌরীশঙ্কর জয় শম্ভো।
জয় শম্ভো জয় শম্ভো শিব গৌরীশঙ্কর জয় শম্ভো।
করচরণকৃতং বাক্কায়জং কর্ম্মজম্বা।
শ্রবণনয়নজম্বা মানসং বপরাধম্।
বিদিতমবিদিতম্বা সর্বমেতৎ ক্ষমস্ব।
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

ওঁ নমো পার্ব্বতী পতে হর হর মহাদেব শম্ভো।

অসতো মা সদ্‌গময়ো
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়

9/98 C

ওঁ

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

পরমহংস শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ বাবার

সংক্ষিপ্ত

চরিতামৃত

স্বামী শিবানন্দ (শিববাবা)

প্রকাশক—
শ্রীমনীমোহন ঘোষ,
৬২, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড,
কলিকাতা-১৪।

LIBRARY
No. 9/98 C
Shri Shri ... Ashram
B...

মুদ্রাকর—
এশিয়ান প্রিণ্টার্স,
পি-১২, সি.আই.টি রোড,
কলিকাতা-১৪।

মূল্য—
এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা

প্রশংসা পত্র

"শিববাবা পরমহংস শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ বাবার সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত পাঠে যথার্থ আনন্দ পাইলাম। আমার মনে হয় উক্ত পুস্তিকা পাঠে ধর্ম্মপিপাসুকেরা উপকৃত হইবেন।"

স্বামী গম্ভীরানন্দ। (বেলুড় মঠ)

"শিববাবা তোমার পরমারাধ্য গুরুদেবের চরিতামৃত পাঠে অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আমার মনে হয় সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে তোমার মতন গুরু ভক্ত হিন্দুর ঘরে ঘরে প্রয়োজন।"

সঙ্গীতাচার্য্য অমরনাথ ভট্টাচার্য্য

"আমার মনে হয় বর্ত্তমানে কাশীতে যাহারা বাস করিতেছেন প্রভুজী শ্রীশ্রীহরিহর বাবা ও পরমহংস বিশ্বনাথ বাবার সহিত আমার চেয়ে বেশী আলাপ আলোচনা করিবার সৌভাগ্য কাহারও হয় নাই। শিববাবা তোমার লেখা চরিতামৃত খানি পড়িবার সময় কি আনন্দ হইতেছিল তা ভাষায় ব্যক্ত করিতে না পারিলেও, আমার মনে হইতেছিল যেন প্রভুজী ও বিশ্বনাথ বাবার কাছে বসিয়া আছি।"

স্বামী রামস্মরণ ব্রহ্মচারী
(শ্রীশ্রীহরিহর বিদ্যাভবন বারানসী)

"ভাই শিববাবা তোমার পূজ্যপাদ গুরুদেবের চরিতামৃত পাঠে অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। তোমাকে বাল্যাবস্থা হইতে ছোট ভাইয়ের মতন স্নেহ করি তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার গুরু ভক্তি বহু গুণে বৃদ্ধি হইয়া বিশ্বের মঙ্গল হউক।"

স্বামী মহেশ্বরী নন্দগিরি
(ভোলাগিরি বিদ্যাভবন, বারাণসী)

৭/৭৪৫

উৎসর্গ পত্র

গুরুপদে সঁপে দেওয়া কায়মন প্রাণ
ইষ্টধন গুরু-পদ যাঁর সদা ধ্যান,
যাঁর কাছে সব মায়া
বিনা গুরু পদ ছায়া
বহু খুঁজে আজ তার পাইনু সন্ধান
তুমি মোর দীনেশদা সেই মহাপ্রাণ
তাই তব পুত করে
দিনু হরষিত অন্তরে
গুরু কৃপায় গাঁথা এই আখ্যান
শ্রীগুরু-জীবন গীতা অমৃত সমান।

—গ্রন্থকার

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে—
১১ই মাঘ, শনিবার, সন ১৩৭০, ভৈমী একাদশী

LIBRARY
No..........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ওঁনম নারায়ন বিশ্বনাথ	১
ভূমিকা	২
উপক্রমণিকা	৩
গুরুমাহাত্ম	৫
জয়গুরু ও বন্দনা	৭
জন্মপর্ব্ব	৮
মহাবীরের উপস্থিত	১১
পাঠশালা ও চুচুড়ার হাইস্কুল	১১
মানকড়ে তিনঘণ্টা সমাধিস্থ	১২
মহাপুরুষ আত্মারামের সহিত সাক্ষাত	১৩
উপনয়ন, মাতাঠাকুরাণীর স্বর্গারোহন ও গৃহত্যাগ	১৩
কাশীপর্ব্ব ও প্রভুজীর পরিচয়	১৪
সন্নাস শিষ্যদের পরিক্ষা	২৮
তীর্থ পর্য্যটনে বিশ্বনাথ বাবা	৩০
কানাইবাবুর দেহ ত্যাগ	৩২
কাশীতে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত	৩৩
চিত্রকুট পাহাড়ে বিশ্বনাথ বাবা	৩৭
সরোজেন্দুবাবুর বাটি ও নিজ জন্ম-ভূমিতে গমন	৩৮
বৃন্দাবনে সেবাকুঞ্জে রাত্রিযাপন	৩৯
কীরণদার কন্যার পুত্র লাভ	৩৯
আমার মহাপুরুষের কৃপালাভ	৪১
৬০ জনের খাবারে ২৪০ জন	৪৭
হরতালের দিনে	৪৯
কালীঘাটের মন্দিরে	৫১
শিবরাত্রির দিনে	৫৪
১লা চৈত্র প্রভুর জন্মদিবস	৫৬
কাশীতে যাইবার আগের দিন	৫৭
আশ্রমের ভীত পুজা ও কলিকাতায় কুমারী পুজা	৫৯
কিরণদাকে রেজিষ্টারী পত্র	৬০
পাইয়াও কুল হারাইলাম ধরাতে	৬০
বিশ্বনাথ বাবার উপদেশ	
হরিহর বিশ্বনাথ আশ্রম ও সরজু বাবা	৬৭
হনুমান চল্লিশা	৭৯
সংকট মোচন	৮২
শ্রীরামনামসঙ্কীর্ত্তণম্	৮৪
শিববন্দনা ও কালীর বন্দনা	৯৩-৯৪
ভজন ও গুরু প্রণাম	৯৫-১০০

LIBRARY
No. 9/98 C
Shri Shri Ma ... mayee Ashram
BANARAS.

ওঁ

নমো নারায়ণ বিশ্বনাথ
বিশ্বেশ্বর বিবেক ভাস্কর হে।
নমো যোগীবর মহাদেব
ত্যাগীশ্বর শম্ভুহে ॥
ব্রহ্ম বীর্য্য ক্ষমার প্রতীক
বঙ্গজননীর প্রিয় সন্তান হে।
শ্রীহরিহরের চরণ স্মরিয়ে
বিশ্বেমহান হইলে হে ॥
জয় জয় বিশ্বগুরু বিশ্বনাথ
জয় ভকতের ভগবান হে।
হে মোর প্রাণা পূর্ণ ব্রহ্ম রাম
মিনতি তব শ্রীচরণে শিবের হে
জনম জনম গুরুরূপে যেন
পূজিতে পাই ও শ্রীচরণ হে ॥

ওঁ

গুরু

ভূমিকা

গুরু দুই প্রকার যথা শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু। মনুষ্য জীবনে দুই গুরুরই প্রয়োজন হয়। যাঁহার কাছ হইতে শিক্ষা অর্থাৎ জাগতিক জ্ঞানলাভ করা হয় সাধারণতঃ তাহাকেই শিক্ষাগুরু বলে। শিক্ষা গুরুর মধ্যে পিতা ও মাতা সর্বশ্রেষ্ঠ। শিক্ষাগুরু মনুষ্য ছাড়া যে কোন প্রাণীও হইতে পারে, এমনকি একটা পিঁপড়াও হইতে পারে। শিক্ষাগুরুর কাছ হইতে কোন আধ্যাত্মিক শক্তি পাওয়া যায় না, তবে বুদ্ধি শক্তি কি করিয়া বৃদ্ধি পায় তিনি সেই পথ দেখাইয়া দিতে পারেন।

এক কথায় বলিতে গেল স্বরূপে পুনরায় ফিরিয়া যাইবার রাস্তা যিনি দেখাইয়া দেন, তাঁহাকে দীক্ষাগুরু বলে, শাস্ত্রে দীক্ষাগুরুকে সূর্য্যের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, আর জাগতিক জ্ঞানকে সমুদ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সমুদ্রের জল বৃষ্টিতে পরিণত হয়; অথচ সমুদ্রের জল নোনা আর বৃষ্টির জল স্বাদু। সূর্য্য ইহার একমাত্র কারণ, তিনি সমুদ্র বারিকে প্রথমে বাষ্পে ও তৎপরে বৃষ্টিতে পরিণত করেন। দীক্ষাগুরু সূর্য্যের ন্যায় জাগতিক জ্ঞানকে শুদ্ধজ্ঞানে পরিণত করার রাস্তা দেখাইতে পারেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কৃপাবশতঃ শিষ্যের ভিতর শিব শক্তি সঞ্চারিত করিয়া শিষ্যকে স্বরূপে যাইবার পথে আগাইয়া দিতে পারেন, সেই কারণে শাস্ত্রে বলা হইয়াছে।

প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী জানিবে যাঁহারে,
গুরুরূপে হৃদি পদ্মে বসাইবে তাঁহারে॥

পরমহংস শ্রীশ্রী বিশ্বনাথ বাবার চরিতামৃত উপক্রমণিকা

আমি অল্পদিন পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ বাবার শ্রীচরণ কমল সেবার অধিকার পাইয়াছিলাম, তখন প্রতি মূহুর্তে মনে হইত তিনি তাঁহার যে কোন শিষ্য অপেক্ষা আমাকে বেশী স্নেহ করিতেন।

একদিন তাঁহাকে বলিলাম প্রভু আপনার ও প্রভুজীর জীবনী কোন লেখকের লেখা উচিত ছিল, তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রভুজীর সম্বন্ধে একটা ছোট বই আছে। তবে তাঁহার পূর্ণলীলা সম্বন্ধে একটি বৃহৎ পুস্তক লিখিলে মন্দ হয় না।"

প্রভুর কোন শিষ্য তাঁহার কাছ হইতে তাঁহার জীবনের কিছু শুনিতে চাহিলে তিনি বিশেষ কিছু বলিতেন না। কোন এক শিষ্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিবার পর তিনি বলিয়াছিলেন, "যখন দরকার মনে করিব তখন তোমাকে জানাবো।"

তিনি দেহ ত্যাগ করিবার কয়েক দিন আগে উক্ত শিষ্যকে তাঁহার জীবনের লীলা সম্বন্ধে দশ পৃষ্ঠায় লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি রেজিষ্ট্রারি করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

প্রায় পাঁচ বৎসর পরে বহু চেষ্টার পর প্রভুর নিজের হাতে লেখা জীবনীটি উক্ত গুরু ভাইয়ের কাছ হইতে পাইবার পর স্থির করিলাম যে এখন আমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য প্রভুর জীবনী ধারাবাহিক ভাবে কোন খাতার পৃষ্ঠায় লিখিয়া রাখা, পরে কোন ভক্ত ইচ্ছা করিলে কোন লেখককে দিয়া লিখাইয়া ছাপাইতে পারে। অতএব এখন আমার কর্তব্য হইতেছে, প্রভুর জন্মভূমি, ঐ ভিটা ও যেখানে যেখানে প্রভু গিয়াছিলেন সেই সকল স্থান দেখিয়া আসা।

ওঁ

গুরু

ভূমিকা

গুরু দুই প্রকার যথা শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু। মনুষ্য জীবনে দুই গুরুরই প্রয়োজন হয়। যাঁহার কাছ হইতে শিক্ষা অর্থাৎ জাগতিক জ্ঞানলাভ করা হয় সাধারণতঃ তাহাকেই শিক্ষাগুরু বলে। শিক্ষা গুরুর মধ্যে পিতা ও মাতা সর্বশ্রেষ্ঠ। শিক্ষাগুরু মনুষ্য ছাড়া যে কোন প্রাণীও হইতে পারে, এমনকি একটা পিঁপড়াও হইতে পারে। শিক্ষাগুরুর কাছ হইতে কোন আধ্যাত্মিক শক্তি পাওয়া যায় না, তবে বুদ্ধি শক্তি কি করিয়া বৃদ্ধি পায় তিনি সেই পথ দেখাইয়া দিতে পারেন।

এক কথায় বলিতে গেল স্বরূপে পুনরায় ফিরিয়া যাইবার রাস্তা যিনি দেখাইয়া দেন, তাঁহাকে দীক্ষাগুরু বলে, শাস্ত্রে দীক্ষাগুরুকে সূর্য্যের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, আর জাগতিক জ্ঞানকে সমুদ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সমুদ্রের জল বৃষ্টিতে পরিণত হয়; অথচ সমুদ্রের জল নোনা আর বৃষ্টির জল স্বাদু। সূর্য্য ইহার একমাত্র কারণ, তিনি সমুদ্র বারিকে প্রথমে বাষ্পে ও তৎপরে বৃষ্টিতে পরিণত করেন। দীক্ষাগুরু সূর্য্যের ন্যায় জাগতিক জ্ঞানকে শুদ্ধজ্ঞানে পরিণত করার রাস্তা দেখাইতে পারেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কৃপাবশতঃ শিষ্যের ভিতর শিব শক্তি সঞ্চারিত করিয়া শিষ্যকে স্বরূপে যাইবার পথে আগাইয়া দিতে পারেন, সেই কারণে শাস্ত্রে বলা হইয়াছে।

প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী জানিবে যাঁহারে,
গুরুরূপে হৃদি পদ্মে বসাইবে তাঁহারে॥

পরমহংস শ্রীশ্রী বিশ্বনাথ বাবার চরিতামৃত উপক্রমণিকা

আমি অল্পদিন পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ বাবার শ্রীচরণ কমল সেবার অধিকার পাইয়াছিলাম, তখন প্রতি মূহূর্তে মনে হইত তিনি তাঁহার যে কোন শিষ্য অপেক্ষা আমাকে বেশী স্নেহ করিতেন।

একদিন তাঁহাকে বলিলাম প্রভু আপনার ও প্রভুজীর জীবনী কোন লেখকের লেখা উচিত ছিল, তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রভুজীর সম্বন্ধে একটা ছোট বই আছে। তবে তাঁহার পূর্ণলীলা সম্বন্ধে একটি বৃহৎ পুস্তক লিখিলে মন্দ হয় না।"

প্রভুর কোন শিষ্য তাঁহার কাছ হইতে তাঁহার জীবনের কিছু শুনিতে চাহিলে তিনি বিশেষ কিছু বলিতেন না। কোন এক শিষ্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিবার পর তিনি বলিয়াছিলেন, "যখন দরকার মনে করিব তখন তোমাকে জানাবো।"

তিনি দেহ ত্যাগ করিবার কয়েক দিন আগে উক্ত শিষ্যকে তাঁহার জীবনের লীলা সম্বন্ধে দশ পৃষ্ঠায় লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি রেজিষ্ট্রারি করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

প্রায় পাঁচ বৎসর পরে বহু চেষ্টার পর প্রভুর নিজের হাতে লেখা জীবনীটি উক্ত গুরু ভাইয়ের কাছ হইতে পাইবার পর স্থির করিলাম যে এখন আমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য প্রভুর জীবনী ধারাবাহিক ভাবে কোন খাতার পৃষ্ঠায় লিখিয়া রাখা, পরে কোন ভক্ত ইচ্ছা করিলে কোন লেখককে দিয়া লিখাইয়া ছাপাইতে পারে। অতএব এখন আমার কর্তব্য হইতেছে, প্রভুর জন্মভূমি, ঐ ভিটা ও যেখানে যেখানে প্রভু গিয়াছিলেন সেই সকল স্থান দেখিয়া আসা।

তখন প্রভুর জন্মভূমি ইত্যাদি দেখিয়া আসিলাম ইহার পূর্বে অনেক যায়গা দেখিয়া আসিয়াছিলাম। ও পত্রের মারফৎ কয়েক যায়গার খোঁজ লইলাম তারপর প্রভুর প্রেরণায় আগে প্রভুর দেশের ভ্রমণ কাহিনী লিখিলাম, তারপর তাঁহার মহতী কৃপায় তাঁহার লীলা কাহিনী লিখিয়া রাখিলাম। এই লেখার জন্য আমার কোন কৃতিত্ব নাই, যদি কাহারও কৃতিত্ব থাকে তবে তাহা আমার প্রত্যেক গুরু ভাইও ভগ্নিদের। সবচেয়ে বেশী ধন্যবাদ পাওয়া উচিত পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীসরযু বাবার, আমার মনে হয় শ্রীশ্রীসরযু বাবা আমাকে প্রভু জীরও প্রভুর লীলা কাহিনী শোনাইবার জন্য দেহ ধারণ করিয়াছিলেন কারণ প্রভু ও প্রভুজীর লীলা কাহিনী শুনাইবার অল্প কয়েক দিন পরেই তিনি দেহ ত্যাগ করেন। পরিশিষ্ট (ক) এই অধ্যায়ে হরিহর বিশ্বনাথ আশ্রম ও শ্রীশ্রীসরযু বাবার সম্বন্ধে যৎসামান্য পরিচয় দেওয়া হইল।

পরিশিষ্ট "খ"

এই অধ্যায় লিখিবার প্রধান উদ্দেশ্য প্রভুজী ও প্রভু বিশ্বনাথ বাবা সদাই যে যে নাম শুনিতে ভাল বাসিতেন ও সকলকে যে যে নাম গুলি সদাই উচ্চারণ করিতে বলিতেন যথা—শিবোহং, শিবোহং, শিবোহং, রাম, রাম, রাম ও মহাবীরের স্মরণ হনুমান চল্লিশা ও সঙ্কটমোচন পাঠ তাহা সকলকে জানান। ইহাতে তাহাদের মহতী উদ্দেশ্য সাধিত হইবে এবং অনেক ভক্ত পাঠকের এই অধ্যায় নিত্য পাঠে উপকার হইবে। বিশেষতঃ শ্রীশ্রীতুলসীদাস রচিত হনুমান চল্লিশা ও সঙ্কট মোচনের কোন বাঙ্গালা অনুবাদ নাই।

আমি প্রথম ধর্ম্মজীবনে প্রভু বিশ্বনাথ বাবার আদেশে পাঠ করিয়া উপকার পাইয়াছি।

আমার অনেক গুরু ভাই, ভগ্নী ও ভক্ত প্রভু বিশ্বনাথ বাবার আদেশে হনুমান চল্লিশা ও সঙ্কটমোচন পাঠ করিয়া উপকার পাইয়াছেন। আশা করি ভক্ত পাঠকেরাও নিত্য পাঠে উপকৃত হইবেন।

ওঁ

গুরু মাহাত্ম্য

গুরুব্রহ্মা গুরুবিষ্ণু গুরুমহেশ্বর,
গুরুমাতা গুরুপিতা গুরুবন্ধুবর।
গুরু পূর্ণব্রহ্ম সারাৎসার পরাৎপর,
আছেন ব্যাপিয়া যিনি বিশ্বচরাচর।
গুরু হতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই ত্রিসংসারে,
তাই গুরুনাম লয় সর্ব্বাগ্রে যে কোন বাসরে।
গুরু নাম না লইয়া যে মোক্ষবাঞ্ছা করে,
পশুবৎ রয় সে যুগ যুগ ধরে।
ধিক তাহার দেহ-জ্ঞানে কুলশীলে আর,
নরাধম সেইজন গুরুজ্ঞান নাই যার।
আর কিবা বলি তারে শুন পূনর্ব্বার
বারে বারে আসা যাওয়া হবে তার সার

দুর্গম সংসার সাগর তরিতে যে চায়
গুরুনাম স্মরণে সেই পার পায়।
রোগ যন্ত্রণা অভিশাপ সব দূরে যায়,
গুরুপূজারীর কভু ব্যাধি নাই হয়।
শয়নে স্বপনে যে গুরুনাম গায়,
মহাবীর সম সে শক্তিশালী হয়।
দেবাদিদেব মহাদেব পঞ্চমুখে কয়,
গুরু তত্ত্ব যে না জানে সে কীটসম রয়।
যে প্রচারিল গুরু তত্ত্ব সর্ব্ব তত্ত্বের সার,
তার চেয়ে জ্ঞানী গুণী কেবা আছে আর!
নিশ্চয় কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়াছে তাঁর
সেই প্রকৃত জ্ঞানীরে আমি নমি বার বার।
বিশ্বগুরু বিশ্বনাথ হে বিশ্বপতি,
তুমি বিনে কে করিবে অগতির গতি।
তব শ্রীমুখের বানী প্রতিটি ওঙ্কার ধ্বনি
সর্ব্বদেবের সার তুঁহু গুরু শিরোমণি।
তোমার কৃপাবিনে কে বুঝিবে তব বিভূতি,
সদাই থাকে যেন শিরের তব শ্রীচরণে মতি।
বিশ্ব গুরু বিশ্বনাথ হে বিবেক ভাস্কর।
(তব) চরণ দুখানি রাখ হৃদিপদ্মপর॥

জয়গুরু

প্রভু আপনার জীবনচরিত লিখিবার মত বিবেক বুদ্ধি আমার নাই। অথচ লিখিবার আগ্রহ কোথা হইতে আসিল তাহা আপনি জানেন। আমার মনে হয় আপনার ইচ্ছা ছাড়া কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব এ প্রেরণা আপনার ইহা মনে করিয়া লিখিবার আগ্রহ ও সাহস হইতেছে, সুতরাং আপনার শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম, অর্থাৎ আপনার শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া কলম ধরিলাম—জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, গুরু কৃপাহি কেবলম্

ওঁ

বন্দনা

তমোগুণ নাশি প্রকৃত সত্যে যে করিল মোরে পরকাশ।
হৃদয় মাঝে রাখিয়া তাঁরে পূজি আমি বারোমাস॥
জন্মজন্মান্তরের কু বাসনারে যে হেরিলো গো আজ।
মম হৃদি মাঝে সদাই সে যে করিছে বিরাজ॥
যাঁহার কৃপায় ইষ্টেরে আজ পাইয়াছি আমি।
সে যে বিশ্বগুরু বিশ্বনাথ সে মোর জগৎস্বামী॥
প্রভু তুহারি আশীষ লইয়া আজি তব গুণ গান গাঁথি।
তব শ্রীচরণে থাকে যেন প্রভু সদাই শিবের মতি॥

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহম
পরিত্রাণায় সাধুণাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

পৃথিবীতে যখন পাপের মাত্রা বাড়িতে থাকে, মানব পথ ভ্রষ্ট হইয়া বিপথ গামী হয় ও তাঁহার ভক্তের উপর অত্যাচার সুরু হয়। তখন তিনি সত্য রক্ষার্থে দেহ ধারণ করিয়া বিশ্বমাঝে অবতরণ করেন।

তাঁহার কার্য্য সত্য শিক্ষা, অর্থাৎ যে পথে চলিলে আমরা তাঁহার ইচ্ছা অনুযায়ী প্রকৃত সত্য ধর্ম্ম পালন করিয়া, পুনরায় তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারি।

তাঁহাকে আমরা অবতার বা জগদ্ গুরু বলিয়া থাকি। তিনি বহুবার বহুরূপে বিশ্বের কল্যানার্থে অবতরন করিয়াছেন ও করিবেন।

যথা :—রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, হজরত মহম্মদ, শঙ্করাচার্য্য, মহাপ্রভু চৈতন্য দেব, তৈলঙ্গস্বামী, পরম হংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, বামাক্ষ্যাপা, প্রভুজী হরিহর বাবা ও পরমহংস শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ বাবা ইত্যাদি।

এই সব মহাপুরুষদের সম্বন্ধে লিখিয়া বা মুখে বলিয়া বুঝাই বার ভাষা পাওয়া যায় না। কারণ ইহা অন্তরের জিনিষ, অতএব নিজে থেকে উপলব্ধি করিতে হয়। অথচ আমার মতন মূর্খের এত বড় সৎসাহস বা দুঃসাহস কোথা হইতে আসিল বলিতে পারি না। আমার মনে হয় যাহার সম্বন্ধে আপনাদের জানাইতে চলিতেছি তাঁহারি প্রেরণা ছাড়া ইহা আর কিছু নয়।

তিনি আমার প্রাণের প্রাণ, আমার ইহকাল, পরকাল, জন্মা-জন্মান্তরের মালিক পরমহংস শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ বাবা।

হুগলি জেলার চুঁচুড়া হইতে ধনেখালি যাইবার পথে সরস্বতী নদী পার হইয়া কয়েক মাইল যাইলে কুন্তী নদী পাইবেন, ঐ নদীর বাঁ পাস ঘেঁসিয়া দক্ষিণ দিকে বেলে মাটির রাস্তা নামিয়া শ্যামদেব-পুরের উপর দিয়া যাইলে যে গ্রামটি পাইবেন সেই গ্রামটি কামদেব-পুর। কামদেবপুর গ্রামটি আয়তনে খুব বড় নয় ছোট বলিলে ভুল হইবে না। আগে উক্ত গ্রামটি একটি নাম করা ডাকাতের দেশ ছিল। এখন যে নাই তাহা বলিতেছিনা, মনে হয় এখনও পূর্ব্বপুরুষদের রূপ উক্ত গ্রামবাসিদের ভিতর লুক্কাইত আছে, ও মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠে।

ঐ গ্রামে কানাই লাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন নিষ্ঠাবান জ্ঞানী কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তখনকার দিনে তাঁহার আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল না। অনেক জমিজমা ছিল ও ঘরে প্রতিষ্ঠা করা বানলিঙ্গ ও শালগ্রাম নারায়ণ ছিলেন। তিনি উক্ত দেবতা-দ্বয়ের ভোগ না দিয়া জল গ্রহণ করিতেন না।

কানাই বাবুর দুইটি কন্যা ছিল, একটির নাম কালী ও অপরটির নাম কমলা। তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। সেই কারণে তিনি গৃহে ঘট পাতিয়া এক বৎসর যাবৎ নিত্য মা চণ্ডীর পূজা করিয়া ছিলেন। ঠিক এক বৎসর পরে মা চণ্ডী তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

অর্থাৎ যে পরম পুরুষের সম্বন্ধে আপনাদের জানাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছি, তিনি যেদিন মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন, সেই দিন তাঁহার গর্ভধারিনী শ্রীমতী ভোলাময়ী দেবী অর্থাৎ কানাই বাবুর স্ত্রী স্বপ্নে হরগৌরীর মূর্ত্তি দর্শন করেন তাহারপর হইতে যত দিন না পরম

পুরুষ ভূমিষ্ট হন প্রায় কানাই বাবু ও তাহার স্ত্রী কোন দেব দেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিতেন। এক দিন কানাই বাবুর স্ত্রী স্বপ্ন দেখিলেন ও শুনিতে পাইলেন যেন স্বয়ং চতুর্ভূর্জ নারায়ণ তাঁহার সামনে আসিয়া বলিতেছেন যে বিশ্বের মঙ্গলের জন্য আমি তোর কাছে আসিতেছি। ঠিক ঐ সময় দেখা যায় কোথা হইতে এক অজানা বৃদ্ধ বৈষ্ণব কামদেবপুরে এক গাছ তলায় আশ্রয় লইয়াছেন।

১৩২০ সাল ১লা চৈত্র রবিবার চতুর্থী মূখ্যচান্দ্র ফাল্গুন গৌন চৈত্র কৃষ্ণপক্ষ হিন্দি চৈত্র বাদি রাত্রি ৯৷৷০ টায় কানাই বাবুর বাড়ি হইতে শঙ্খের ধ্বনি শোনা গেল। গ্রামের অনেক মহিলা, বালক বালিকা ও কানাইবাবুর সমবয়স্ক কয়েকজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তার পর দেখা গেল সকলে চুপ কাহারও মুখ হইতে বাক্য সরিতেছে না পরস্পর মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। কারণ তখন অবধি শিশু নড়ে নাই, কাঁদে নাই ও চক্ষু খোলে নাই।

ঠিক সেই সময়ে উপরোক্ত বৃদ্ধ বৈষ্ণব হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোমাদের ভাবিবার কোন কারণ নাই। ঐ শিশু তোমার আমার মতন নহে, উনি জগতের মঙ্গলের জন্য অবতরণ করিয়াছেন, এ বাটিতে যে বিগ্রহ আছেন সেই বিগ্রহের চরণামৃত ঐ শিশুর মুখে ও চোখে দাও তাহা হইলে তোমাদের চিন্তা দুর হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ বৈষ্ণবের কথা মতন কার্য্য হইবা মাত্র দেখা গেল তাঁহার চক্ষু ও মুখ খুলিয়াছে ও আরো আশ্চর্য্যের বিষয় মনে হইল ঐ শিশু যেন হাত তুলিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে।

শিশু দিন দিন শশীকলার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তৎসহ

তাঁহার আব্দার ও বায়নার মাত্রাও বাড়িতে লাগিল। তাঁহার বায়না থামাইবার এক মাত্র ঔষধ ছিল রামায়ন পাঠ। রামায়ন পাঠের সময় বালক ধীর ও স্থির হইয়া বসিয়া শুনিতেন, যেন মনে হইত একটি পুতুল বসিয়া আছে।

বালক পাঁচ বৎসরে পদার্পণ করিলে কানাই বাবু গৃহ বিগ্রহের সামনে বালকের হাতে খড়ি দিলেন এবং কিছুদিন বাদে গ্রাম্য পাঠ শালায় ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ঐ সময়ে একদিন বালক বিশ্বনাথ দুপুরে বাহিরে যাইবার জন্য বায়না ধরিলে তাঁহার মাতাঠাকুরানী কোন উপায় না পাইয়া রামায়ন পাঠ আরম্ভ করিলেন, তখন বালক চুপ করিয়া রামায়ণ শুনিতে লাগিলেন, ঠিক ঐ সময়ে কোথা হইতে একটি হনুমান আসিয়া রান্না ঘরের দাওয়ার চালার একটি বাঁশ ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল। তখন বালক জোড়হাত করিয়া বলিল হনুমানজী—থাম থাম, তুমি ওরকম দোল খাইলে ভুমিকম্প হইবে, বাকসিদ্ধ বালকের মুখ হইতে কথা বার হইয়া মাত্র দেখা গেল চারিদিক হইতে শঙ্খ বাজিতেছে। ইহার পর হনুমানটি বাঁশ হইতে নামিয়া বালকের কাছে আসিয়া তাঁহার মাথায় একটি হাত রাখিয়া ও কানের কাছে মুখ রাখিয়া যেন কি বলিতেছে মনে হইল। তাহার পর মূহুর্ত্তে সেই স্থান হইতে অন্তর্ধান করিল। এ সমস্ত দেখিয়া বালকের মাতা হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন।

বালক অল্পদিনের ভিতর পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করিলে কানাই বাবু তাঁহাকে চুঁচুড়া ষণ্ডেশ্বরতলার ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তখন বালক তাঁহার পিতাঠাকুরের সঙ্গে নিত্য গঙ্গাস্নান ও বাবার পূজা

করিতেন। উক্ত ইংরাজি স্কুলের শিক্ষকেরা বালকের মেধা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন ও পরস্পরে বলাবলি করিতেন যে এ বালক মা সরস্বতীর বরপুত্র কেহ বা বলিতেন এ নিশ্চয় অবতার। ঐ সময় অনেকে তাহাকে শম্ভু বলিয়া ডাকিত।

বিশ্বনাথ বাবার পিতামহীর বর্দ্ধমান জেলায় মানকড়ে পৈত্রিক কিছু জমি ও বাস্তুভিটা ছিল, ঐ ভিটার উঠানের মাঝখানে চালাদোয়া মঞ্চ ছিল মঞ্চের ভিতর মা কালীর একটি ফটোছিল, ও বাহিরে চারি পাশে তুলসী গাছ ছিল। বালক বিশ্বনাথ একবার তাঁহার পিতা ঠাকুরের সঙ্গে মানকড়ে যান। তার পর উক্ত মঞ্চে গিয়া মা কালীর ছবিটি দর্শন করিবামাত্র সমাধিস্থ হন, ঐদিন তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল ঐ সময় তাঁহার পিতাঠাকুর ও মান কড়ের গ্রামবাসিরা চিন্তিত হইয়া পড়েন। সেখানেও দেখা গেল এক বৈষ্ণব আসিয়া বলিলেন তোমরা এত চিন্তিত হইতেছ কেন। এ বালক আমাদের মতন সামান্য লোক নহেন, উনি জগতের মঙ্গলের জন্য অবতরণ করিয়াছেন, উহার কাছে তারক ব্রহ্মনাম কর তাহা হইলে উহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিবে। দেখা গেল বৈষ্ণবের কথা ঠিক হইল। যে কয়দিন বিশ্বনাথ বাবা মানকড়ে ছিলেন, ঐ গ্রামবাসিরা নিত্য তাঁহাকে লইয়া শ্রীখোল ও করতাল সমেত নাম কীর্ত্তন করিতেন ও বলিতেন এই আমাদের বৃন্দাবন। তখন হইতে তাঁহার আর এক নাম হইল গোপাল। মানকড় হইতে ফিরিবার পর দেখা গেল তিনি পূর্বাপেক্ষা গম্ভীর ও বেশির ভাগ সময় ধ্যানস্থ থাকেন।

বৈশাখ মাসে ভগবান ভুতনাথ ভোলানাথ ষণ্ডেশ্বর শিব তলায়

এক মেলা হয় ও মাসাধিক কাল ঐ মেলা থাকে। ঐ মেলা সাধারণ মেলার মতন নহে। ইহা একটু বড় রকমের মেলা ও নানা দেশের সাধু মহাত্মারা ঐ সময় উপস্থিত হন।

সে বারে এক মহাপুরুষ ঐ মেলায় আসেন নাম আত্মারাম। বালক বিশ্বনাথ যখন মন্দির পরিক্রমা করিতেছিলেন সে সময় উক্ত মহাপুরুষ তাঁহাকে বলিলেন 'বেটা তুই কে কোথায় থাকিস? তোর নাম কি?' বালক বিশ্বনাথ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া থাকাতে তিনি বলিলেন বিদ্যা এই, যে বিদ্যা লাভ করিলে সমূহ অবিদ্যা নষ্ট হইয়া যায়। সে বিদ্বান আর মিথ্যার সংসারে আবদ্ধ থাকেনা, এই বলিয়া তিনি বালক বিশ্বনাথের মাথার উপর হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আরও বলিলেন বেটা তুই ভবিষ্যতে অদ্বিতীয় মহাপুরুষ হইবি ও অনেক সংসারী জীবকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত করিবি।

ইহার পর তাঁহার উপনয়ন হয় তখন তাঁহার বয়স নয় বৎসর। কিন্তু দুঃখের বিষয় উপনয়নের চতুর্থ দিবসে অর্থাৎ দণ্ডীভাসানের দিনে দশেরা অর্থাৎ বিজয়া দশমীতে তাঁহার মাতা ঠাকুরাণী দেহ রক্ষা করেন। তারপর তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধ সমাপন হইলে, সেই দিন গভীর রাত্রে কাহাকেও না জানাইয়া গৃহত্যাগ করেন। প্রথমে ৺তারকেশ্বরে গিয়া বাবার পূজা করিয়া জঙ্গলের পথ ধরেন, কারণ রাস্তা দিয়া যাইলে কেহ যদি তাহাকে দেখিতে পায় তাহা হইলে তাঁহাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে হইবে। সেই সময় তাঁহার আহার্য্য ছিল গাছের ফল ও বিশ্রাম লইবার স্থান ছিল গাছের কাণ্ড, রাত্রিতে

গাছে উঠিয়া কাপড় দিয়া নিজের দেহ কাণ্ডের সহিত বাঁধিয়া নিদ্রা যাইতেন। এইরূপে বেশ কিছুদিন কাটিবার পর তাঁহার হাঁটা পথ শেষ হইল কাশী পৌঁছিয়া।

অবিমুক্তক্ষেত্র কাশীর সম্বন্ধে সকলের কিছু কিছু জানা আছে। আদিকাল হইতে প্রবাদ আছে যে "কাশী পৃথিবীর বাহিরে।" সেই কারণে রাজা হরিশচন্দ্র কাশীতে থাকিবার স্থান পাইয়াছিলেন। তা ছাড়া কাশী ভারতবর্ষের একটি মহাতীর্থ ক্ষেত্র, কারণ স্বয়ং বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণা কাশীতে বাস করেন।

কাশীতে পৌঁছিয়া তাঁহার মনে এই চিন্তার উদ্রেক হইল যে কাশী পুরী, শিবপুরী, প্রত্যক্ষ কৈলাস পুরী, পূর্ণতোয়া তপো ভূমি ও মোক্ষ ভূমি এবং ভগবান ভোলানাথ ও মাত অন্নপূর্ণা সদাই কাশীতে বিরাজ করিতেছেন। তারপর তিনি মণিকর্ণিকায় স্নান সারিয়া কাপড় ধৌত করিয়া উপরে উঠিয়া খানিকক্ষণ একস্থানে বসিয়া মৌন থাকিবার পর তার পরিধানের কাপড় ছিড়িয়া কৌপিন বানাইয়া পরিলেন ও একটি মাত্র বহির্বাস রাখিয়া সঙ্গে যাহা ছিল সব ত্যাগ করিলেন।

তাহার পর বিশ্বনাথ জীউর মন্দিরে গিয়া ভক্তির সহিত পূজা করিলেন ও একধারে দাঁড়াইয়া বিশ্বনাথের স্তুতি করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ঐ মন্দিরের মূল পুরোহিত আসিয়া তাঁহার হাতে কিছু প্রসাদ দিলেন। এক ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া খাইবার জল আনিয়া দিলেন। পাণ্ডাঠাকুর বলিল বাবা এখুনি ভোগ লাগিবে আপনি ভোগ না লইয়া যাইবেন না তখন তিনি মনে মনে ভাবিতে

লাগিলেন, সত্যসত্যই মা অন্নপূর্ণা এই কাশীতে বিরাজ করিতেছেন।

ঐখানে কয়েক দিন থাকিবার পর তিনি কেদার-নাথ দর্শনার্থে গঙ্গার ধার দিয়া হাঁটা পথ ধরিলেন। কেদারেব মন্দিরের কাছে এক খেয়া ঘাট আছে, সেখানে একটি বড় বজরা বাঁধা ছিল। ঐ বজরার মাঝিকে বলিলেন, কেদারের মন্দির কত দূর? মাঝি তাহাকে বুঝাইয়া দিল ও জিজ্ঞাসা করিল, কোথা হইতে আসিয়াছ, এখানে কোথায় উঠিয়াছ ও কি কর? তিনি বলিলেন আমি বাঙ্গালা -দেশ হইতে আসিয়াছি, এখানে শঙ্করের প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এক মহাত্মা আছেন তাঁহার স্মরনাগন্ন হইবার বাসনা আছে।

তখন উক্ত নৌকা হইতে সতীশ চন্দ্র দে নামে এক ব্যক্তি তাঁহার কাছে আসিয়া অতি মধুর স্বরে বলিলেন বাবা এই নৌকায় উঠিয়া এসো। এই কথা বলিয়াই বিশ্বনাথ বাবাকে কোন কথা বলিতে না দিয়াই তাঁহাকে প্রেমপূর্ব্বক নৌকায় তুলিয়া লইলেন। প্রভু তখন তাঁহার কাছে বসিয়া কিছু আলোচনার পর মা গঙ্গার ধ্যান ও প্রণাম করিয়া বলিলেন হে মাত গঙ্গে দীন যেন পায় স্থান তব শ্রীচরণে। মা গঙ্গা তাহার উপযুক্ত পুত্রের কথা রক্ষা করিয়াছিলেন।

সতীশ বাবু বলিলেন তুমি আমার কাছে এই নৌকায় থাক গঙ্গায় স্নান কর, গঙ্গা জল খাও, সৎ গ্রন্থ পাঠ কর এবং প্রভুজীর ধ্যান ও পূজা কর। উক্ত সতীশ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরমেশ চন্দ্র দে তখন কাশী রাজার প্রধান কর্মসচিব ছিলেন। কিছুদিন ঐখানে থাকিবার পর সতীশবাবু বিশ্বনাথ বাবাকে বলিলেন এখান হইতে কিছুদূরে নৌকা-

পারে এক মহাত্মা থাকেন তিনি প্রত্যক্ষ নররূপীনারায়ণ, তিনি সংসারী জীবের উদ্ধারের তরে হরি ও হর দুইই এক দেহে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার শিক্ষা গঙ্গাজল পান কর, রামনাম জপ কর ও শিবোহং, শিবোহং, শিবোহং এই মহাবাক্য বা মহামন্ত্র জপ কর।

তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় পূর্ণব্রহ্ম সাক্ষাৎ শঙ্করের প্রতিমূর্ত্তি বিশ্বের মঙ্গলের জন্য সাকার রূপ ধারণ করিয়াছেন, সতীশ বাবুর মুখে শুনিবামাত্র তাঁহার মনে হইল এই মূহুর্ত্তে পরম আরাধ্য প্রত্যক্ষ নর-রূপী ভোলানাথের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আসি। তখন সন্ধ্যা আগত প্রায় ঐ মহাপুরুষ নাগোয়াতে থাকায় সেই দিন আর তাঁহার নিকট যাওয়া হইল না।

আহারাদির পর নিদ্রা যাইলে স্বপ্নে দেখিলেন ঠিক সতীশবাবুর উপমানুযায়ী সেই মহাপুরুষ তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহার মাথাটি নিজের কোলের উপর রাখিয়া কানে বেদ মন্ত্র দিলেন। সে কৃপা অসীম কৃপা, কৃপাসিন্ধুর কৃপার পারাপার নাই, এরূপ কৃপা কেহ পাইয়াছে কিনা তখনও তাঁহার জানা ছিল না।

পরদিন স্নানাদি পর্ব সমাপ্ত করিয়া নহাপুরুষের শ্রীচরণ দর্শনার্থে যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া যাহা দেখিলেন ও যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাঁহার নিজহস্ত লিখিত রেজিষ্ট্রারী পত্র হইতে এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

সেখানে গিয়া কি দেখিলাম। প্রত্যক্ষ বিশাল আকার, জটাজুট ধারী এক দিগম্বর, স্বয়ং ভোলানাথ, ভগবৎ ধ্যানে তন্ময়, তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল সার্থক মম জনম, আজ আমার পুর্ণ জীবন লাভ

প্রভুজী

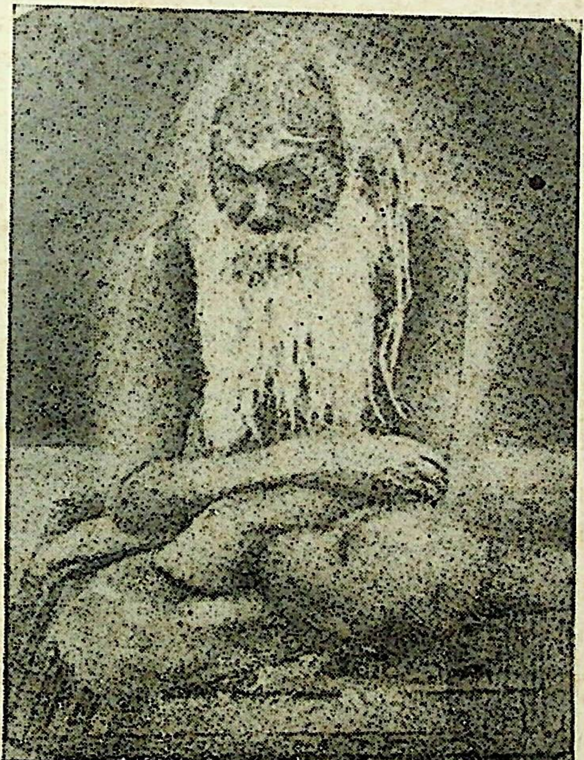

ভগবান শ্রীশ্রীহরিহর বাবা

হইল। আজ আমার কি পরম সৌভাগ্য তৎক্ষনাৎ আমি ধীরে ধীরে সেই পরম পুরুষের কাছে গিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আমার মাথা রাখিলাম। তখন তিনি চক্ষু খুলিয়া অতি মধুর বাণীতে বলিলেন "মেরা বিশ্বনাথ আগেয়া" এই কথা শুনিবা মাত্র পুনরায় তাঁহার শ্রীচরণ মস্তকে ধারন করিলাম ও একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া গেলাম, তখন আমি জানিলাম না যে আমি কোথা হইতে আসিয়াছি ও কোথায় বসিয়াছি। দেহের সমস্ত ভার ছাড়িয়া অনন্ত কালের জন্য পরমপদে পরম বিশ্রাম পাইলাম। ইহা এই মহাপুরুষের মহতীকৃপা।

জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু

গুরু কৃপাহি কেবলম।

সেখানে শিষ্যেরা ও অনেক ভক্তের দল ছিল সকলে এই দৃশ্য দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল, যেন এক পরম শান্তির রাজ্য স্থাপিত হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে যখন আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল সকলে মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিল, প্রভুজী এ ভক্ত কোন হ্যায়, তিনি বলিলেন "এ আমার কাশীর বিশ্বনাথ" একথা শুনিবামাত্র সকলে আশ্চর্যান্বিত হইলে, প্রভুজী আবার বলিলেন "মেরা বিশ্বনাথ হিঁয়া রহ অর্থাৎ এখানে থাক।

সেই মূহুর্ত্ত হইতে মহাপ্রভুর সেবাতে আমার মন তনমন লীন হইয়া গেল। সেইদিন মধ্যরাত্রি হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু আমাকে যোগ বিদ্যা শিখাইতে লাগিলেন। বাস্তবে ভগবান শঙ্কর জানেন সেই যোগবিদ্যা কৃপাময় কৃপা করিয়া আমাকে দান করিলেন। গুরু কৃপাহি কেবলম্।

এইরূপে কিছুদিন মনের আনন্দে তিনি প্রভুজীর সেবা করিলেন, হঠাৎ একদিন তাঁহার পিতাঠাকুর কানাইবাবু বহু খোঁজ খবরের পর প্রভুজীর বজরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও বিশ্বনাথ বাবাকে লইয়া যাইবার জন্য প্রভুজীকে অনেক অনুরোধ করিলেন। প্রভুজী বলিলেন বিশ্বনাথ যদি তোমার লেড়কা হইত তবে সে তোমার কাছে থাকিত, আর মেরা পুত্র হোগা তো হামকো ছোড়কে কাঁহা নেই যায়েগা, কানাইবাবু কয়েকদিন কাশীতে থাকিবার পর প্রভুজীর প্রসাদ লইয়া, প্রভুজীকে প্রণাম করিয়া ও বিশ্বনাথ বাবাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রভুজীর কাছ হইতে বিদায় লইলেন।

এখানে প্রভুজীর পরিচয় কিছু না দিলে পরমহংস বিশ্বনাথ বাবার আদেশ লঙ্ঘন করা হয় এবং পুস্তক অসম্পূর্ণ হয়।

প্রভুজীর পূর্ব পরিচয় সঠিকভাবে কেউ বলিতে পারেন নাই, কারণ তিনি নিজে থেকে কাহাকেও এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই, কেবলমাত্র তাঁহার দুই একজন প্রিয় সন্ন্যাসী শিষ্যকে ভাসাভাসা কিছু জানাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন কৃপাবশতঃ আমাকে অল্প কিছু জানাইয়াছেন, তিনি হচ্ছেন আমাদের পরম পুজনীয় শ্রীশ্রীসরযুবাবা, আমার পরমারাধ্য গুরুদেবের গুরুভাই। সরযুবাবার সম্বন্ধে এই পুস্তকের শেষে কিছু লিখিব কারণ পরমারাধ্য গুরুদেব ও শ্রীশ্রীসরযুবাবা এই দুইজন গুরু ভাইয়ের এত ঘনিষ্ঠতা ছিল যে এই দুইজনের একজনকে বাদ দিলে এ পুস্তক অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

আর একজন হচ্ছেন প্রভুজীর দ্বার সন্ন্যাস শিষ্যের দেওরপো যিনি বেলুড় মঠ হইতে দীক্ষিত হইবার পর হৃষিকেশে সন্ন্যাস লইয়া

এক কুঠিয়াতে বাস করিতেছেন তাঁহার বর্তমান নাম স্বামী তুরীয়ানন্দ। অনুমান ১২৩৭ হইতে ১২৩৮ সনের মধ্যে প্রভুজী ছাপরা জেলার জাফরাপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত তেওয়ারী ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব আশ্রমের নাম ছিল শ্রীসেনাপতি। শৈশবে তাঁহার পিতৃ ও মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁহারা দুই ভাই ছিলেন। বাল্যকালে লেখাপড়া শিখিবার মানসে সোনপুর নামক এক গ্রামে তাঁহার পরিচিত এক জমিদারের গৃহে অবস্থান করিয়া লেখাপড়া করিতে থাকেন, সেই সময় হইতে তিনি ধ্যান ধারণায় অভ্যস্ত হইয়া উঠেন। কিছুকাল এই স্থানে অবস্থান করিবার পর তিনি ভাগলপুর যান, কিন্তু নানাবিধ অসুবিধার দরুন পূর্বস্থানে অর্থাৎ সোনপুরে প্রত্যাগমন করেন, তাঁহার এত অল্পবয়সে বৈরাগ্যের মূল কারণ হইল তাঁহার হরিহর নামে এক ভাই ছিল তিনি অল্প বয়সে মারা যান, তখন হইতে শ্রীসেনাপতির বৈরাগ্যের উন্মেষ হয় এবং সদাই তাঁহার চিন্তা ছিল কি করিলে জন্ম, জরা ও মৃত্যুর হাত হইতে মানুষের মুক্তি পাওয়া সম্ভব। ভগবান বুদ্ধেরও মড়া দেখিয়া ঠিক ঐরূপ ভাবের উন্মেষ হইয়াছিল।

যখন তিনি ১৮ বৎসরে পদার্পণ করেন সেই সময় একদিন কাহাকে কিছু না জানাইয়া সোনপুর গ্রাম হইতে নিরুদ্দেশ হন। আমার এক গুরু ভাই ডাক্তার অযোধ্যাসিং Glory of Hari Har Babu পুস্তকে লিখিয়াছেন যে তিনি প্রথমে অযোধ্যা যান। এটা ঠিক বা আমি বহু খোঁজ খবরের পর যাহা লিখিতেছি সেটা ঠিক তা আমি আপনাদের জোর করিয়া বলিতে পারি না।

তিনি সোনপুর হইতে প্রথমে এলাহাবাদে গিয়া সেখান হইতে বিন্ধ্যাচল পাহাড়ে পাঁচ বৎসর থাকিবার পর পূর্ব পরিচিত একজনের সহিত তার দেখা হয় তারপর দুই এক দিনের মধ্যে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অযোধ্যা যাইয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন সেখানেও পূর্ব পরিচিত এক বৃদ্ধের সহিত দেখা হয় বৃদ্ধ বলিলেন হরিহর কাভাই তোমার এত অল্প বয়সে সন্ন্যাস লওয়া ঠিক হয় নাই। ঐ সময় হইতে প্রভুজীর নাম হয় হরিহর ভাই। উক্ত বৃদ্ধ হরিহর কা ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন কিন্তু স্থানীয় লোকেরা শুনিয়াছিলেন হরিহর ভাই। পরে হরিহর ভাই হইতে হরিহর বাবা হয়। অনেকে বলেন যে তারপর প্রভুজী মনে করিলেন যে দেশের লোক যখন জানিতে পারিয়াছে তখন এখানে আর থাকা উচিত নয় তখন তিনি কাশীতে চলিয়া যান। মনে হয় এটা ঠিক নয় কারণ আমি খোঁজ খবর লইয়া জানিয়াছি যে তিনি অযোধ্যায় অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর কঠোর সাধনার পর কাশীতে যান।

আর এক মত আছে প্রভুজী যখন সরযুনদীর তীরে ত্রিশ বৎসর কঠোর তপশ্যায় রত ছিলেন সেই সময় একদিন মহাবীর মা জানকী ও জানকীনাথ সমেত উপস্থিত হইয়া প্রভুজীকে বলেন তুমি যদি ইষ্ট পাইতে চাও তাহা হইলে কাশীতে গিয়া বাবা বিশ্বনাথকে আগে তুষ্ট কর সেই মুহূর্ত্তে প্রভুজী অযোধ্যা হইতে কাশীতে যাত্রা করেন।

কাশীতে পোঁছিয়া প্রথমে তিনি তৈলঙ্গস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তারপরে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়া বিশ্বনাথের পূজা

করেন পরে বাবা বিশ্বনাথের আদেশানুযায়ী নাগোয়াতে গিয়া কঠোর তপস্যায় রত হন।

ইহার আগে তৈলঙ্গস্বামী কাশীতে অনেক সন্ন্যাসীকে বলিয়াছিলেন ভবিষ্যতে কাশীর যে শিব সে এখন অযোধ্যায় আছে সে শীঘ্রই কাশীতে আসিবে।

প্রভুজী যখন নাগোয়াতে কঠোর তপস্যায় রত, তখন তৈলঙ্গস্বামী একদিন তাঁহার সন্ন্যাসী ভক্তদের বলেন কিরে, ভবিষ্যতে যে কাশীতে শিব হইবে তাঁহাকে দেখিয়াছিস ? উত্তর হইল না। তৈলঙ্গস্বামী বলিলেন, শিবোহং, শিবোহং, পিবোহং ; তখন একজন বলিল, নাগোয়াতে জলের ধারে একটি সন্ন্যাসী পাথরের উপর বসিরা সদাই ধ্যানস্থ থাকেন। কখন থায়, কি খায়, কেহ বলিতে পারে না। রাত্রি ২৷৷০ হইতে ৩ টার মধ্যে অপর পারে চড়ায় যাইয়া দিনান্তে একবার মাত্র মলমূত্র ত্যাগ করেন, যখন গঙ্গার জল বাড়িয়া পাথরটি ডুবিয়া যায় ও লোকে যখন তাঁহাকে বিরক্ত করে তখন তিনি মাঝ গঙ্গায় গিয়া শবাসনে থাকেন, এবং কখনও কখনও জলের মধ্যেও ২-৩ ঘণ্টা কাটাইয়া দেন, আবার সময় সময় তাহকে মাঝ গঙ্গায় পদ্মাসনেও দেখা যায়।

তৈলঙ্গস্বামী তখন তাহাদের বলিলেন, মাঝে মাঝে তাঁহাকে কিছু খাইয়ে আসিস্ তখন হইতে অনেকে তাঁহার কাছে খাবার লইয়া যাইত। কিন্তু তিনি সকলের খাবার ছুঁইতেন না কখনও ইচ্ছা হইলে কৃপাবশতঃ কাহারও হাতের খাবার হইতে এক কামড় দাঁতে করিয়া কাটিয়া লইতেন।

একদিন কয়েক জন সন্ন্যাসী তৈলঙ্গস্বামীর কাছে গিয়া বলিলেন, আপনি নাগোয়ার সন্ন্যাসীকে মহাপুরুষ বলিতেছেন, কিন্তু সে কেন কাশীর ভিতর আসিতে চায়না, তৈলঙ্গস্বামী বলিলেন, তোমাদের সবেতে অবিশ্বাস, আমার কথার কখনও অন্যথা হইতে পারে না শিবোহং, শিবোহং, শিবোহং। তারপর হাসিতে হাসিতে বলিলেন ওরে জপসিদ্ধ হরিহরের দ্বিতীয় নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে এমনটি আর পাবিনা। ঐ দিক হইতে হরিহর আমার চেয়ে অনেক বড়, শিবোহং, শিবোহং, শিবোহং, পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ওরে মুর্খেরদল হরি—হর এক দেহে বিরাজ করিতেছে, শিবোহং, শিবোহং, শিবোহং, ওরে এক সঙ্গে কি দুই শিব কাশীতে থাকিতে পারে। শীঘ্রই হরিহরকে কাশীতে দেখিতে পাইবি।

তৎপর ১২৯৪ সালে পৌষ মাস শুক্লা একাদশী সায়ং কালের পূর্ব মুহূর্তে লোক চক্ষে তৈলঙ্গস্বামী দেহ ত্যাগ করেন। এই সময় হইতে প্রভুজী প্রায় কাশীতে আসিতেন। এই ভাবে কয়েক বৎসর কাটিবার পর কাশীতে রাজা ও অনেক ভক্ত মিলিয়া প্রভুজীর কাছে আন্তরিক নিবেদন জানাইলেন যে এখন আপনার অনেক বয়স হইয়াছে আমরা একটি বড় নৌকা (বজরা) করিয়া দিব আপনি উক্ত নৌকায় আপনার ইচ্ছামতন উপযুক্ত স্থানে জলের উপর বসিয়া তাহাতে বাস করুন। হরিহর বাবা ইহাতে প্রথমে রাজী হইতে চাহেন নাই, পরে রাজি হইয়া নৌকাতেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটাইয়া দিলেন।

ঐ নাগোয়াতেই দুই মহাপুরুষের মিলন, একজন আমার প্রাণের

প্রাণ, জন্ম জন্মান্তরের মালিক পরমারাধ্য গুরুদের পরমহংস শ্রীশ্রী বিশ্বনাথ বাবা আর একজন হচ্ছেন তাঁহার ইষ্টগুরু পূর্ণ ব্রহ্ম প্রভুজী শ্রীশ্রীহরিহর বাবা।

দুই জনের মধ্যে এরূপ সদ্ভাব ছিল যে খানিকক্ষণ উভয়ের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ না হইলে উভয়েই জগতকে অন্ধকার বলিয়া অনুভব করিতেন, প্রভুজী ডাকিতেন মেরা বিশ্বনাথ, পরমারাধ্য গুরুদেব বলিতেন মেরা গোপাল।

প্রভুজী পূর্বে তাঁহার সান্নিধ্যে সকলকে আসিতে দিতেন না। যে দিন হইতে পরমহংস বিশ্বনাথ বাবাকে কাছে পাইলেন সেইদিন হইতে তাঁহার মনের পরিবর্ত্তন হইল। বিশ্বনাথ বাবা যখন যাহা বলিতেন তখনই প্রভুজী বলিতেন, তোর যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তবে তোর ইচ্ছা পূর্ণ হোক। এই সময় কত কঠিন ব্যাধি বিশ্বনাথ বাবার ইচ্ছায় প্রভুজী সারাইয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এক দিন কাশীর বাঁশফটক হইতে তাহার এক ভক্ত হঠাৎ তাহার রুগ্নস্ত্রীকে শোয়ান অবস্থায় বজরায় আনিয়া উপস্থিত হন, উক্ত রোগিনীর যক্ষা হইয়াছিল। ডাক্তারেরা বলিয়াছিলেন একে আর ঔষধ দিয়া বিরক্ত করিবার প্রয়োজন নাই যেহেতু ইহার বাঁচিবার কোন আশা নাই।

প্রথমে প্রভুজী রাগিয়া বলিলেন, আমি কি ডাক্তার, যে আমার কাছে রোগী লইয়া আসিয়াছিস, কি ভাবিয়াছিস সব, তোদের রোগ সারাবো, তোদেয় স্বামী স্ত্রীরকলহ মেটাবো, কোর্টের রায় বদলাইয়া দিব। এরকম করিবি তো আর আমি এখানে থাকিব না। পর

মুহূর্তে দেখা গেল বিশ্বনাথ বাবার কথায় একেবারে আগুন জলে পরিণত হইল এবং পরমহংস বিশ্বনাথ বাবার ইচ্ছাতেই সেই মুহূর্তে ঐ রোগিণীকে রোগমুক্ত করিয়া ঘরে পাঠাইয়া ছিলেন।

প্রভুজীর শিক্ষা ছিল সদা সত্য কথা বলা (গৃহীদের) রাম নাম জপ, শিবোহং, শিবোহং, শিবোহং এই মহাবাক্য বা মহামন্ত্র জপ, আর সন্ন্যাসীদের ধ্যান, ধারনা ও বেদ-পুরান পাঠ।

কিন্তু বিশ্বনাথ বাবাকে তিনি নিজে থেকে কোন পুস্তক পড়িতে বলেন নাই সেই কারণে বিশ্বনাথ বাবার মাঝে মাঝে অভিমান হইত ও আড়ালে গিয়া কাঁদিতেন। একদিন প্রভুজী বলিলেন, কে আছিস্‌রে দেখ তো বিশ্বনাথ কাঁহে রোতা হ্যায়? তখন সরযু বাবা তাঁহার কাছে বলিলেন বিশ্বনাথ তুমি এখানে কাঁদিতেছ। আর প্রভুজী তোমায় ডাকিতেছেন।

বিশ্বনাথ বাবা প্রভুজীর কাছে যাইলে প্রভুজী বলিলেন মেরে বিশ্বনাথ তু রোতা কাঁহে। প্রভু বিশ্বনাথ বাবা বলিলেন আমায় কিছু পড়িতে দেন না। প্রভুজী বলিলেন, তোকে কিছু পড়িতে হ'বে না। তোর সব পড়া আছে দরকার মতন জানিতে পারিবি।

আর একদিন ঠিক ঐ ঘটনা ঘটিলে প্রভুজী একখানি হিন্দি যোগাবিশিষ্ট রামায়ন বিশ্বনাথ বাবার হাতে দিয়া বলিলেন পড়। বিশ্বনাথ বাবা এর পূর্বে কখনও হিন্দি পড়েন নাই। সেই কারণে তাহার ঐ রামায়ন পড়িতে অসুবিধা হইতেছিল। ইহাতে তিনি মনে ব্যথা পাইলেন ও মনে করিলেন আমি হিন্দি পড়িতে পারিনা জানিয়া প্রভুজী আমাকে হিন্দি রামায়ন পড়িতে দিয়াছেন। প্রভুজী ইহা

জানিতে পারিয়া বিশ্বনাথ বাবাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও বলিলেন আমার সামনে পড়্‌তো। তখন বিশ্বনাথ বাবা হিন্দি রামায়ন সুন্দর ভাবে পড়িতে লাগিলেন। কোন অসুবিধাই আর বোধ করিলেন না। সেই মুহূর্ত্তে বিশ্বনাথ বাবা বুঝিতে পারিলেন কোথা হইতে এ শক্তি তিনি পাইলেন। তিনি উঠিয়া প্রভুজীর পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও ক্ষমা চাহিলেন। গুরুর দেওয়া রামায়ন ছাড়া ঐ দিন হইতে প্রভু বিশ্বনাথ বাবা আর কিছু পড়িতেন না। অথচ তিনি বাংলা, হিন্দি, উর্দ্দু ও ইংরাজী ভাষায় কথা কহিতে এমন কি বক্তৃতা করিতেও পারিতেন।

একদিন বিশ্বনাথ বাবার জ্বর সহ পেটে যন্ত্রণা হইতেছিল। তখন প্রভুজী বলিলেন, বেটা রামনগরিয়াকা পাস যাও। রাজবাড়ীর ডাক্তারকে প্রভুজী রামনগরিয়া বলিতেন উক্ত ডাক্তার প্রভুজীর ভক্ত ছিলেন। বিশ্বনাথ বাবা তৎক্ষনাৎ ছোট নৌকাটি লইয়া রামনগরে গিয়া ডাক্তার দেখাইয়া ঔষধ লইয়া ফিরিলেন। তখন প্রভুজী জিজ্ঞাসা করিলেন রামনগরিয়া ঔষধ দিয়াছে? বিশ্বনাথ বাবা বলিলেন হ্যাঁ প্রভুজী। ও ঔষধে তোর সারবেনা ফেলে দে, গঙ্গামে ডুবদে আর একমুঠা মাটি খাও ও গঙ্গা পানি পিয়ো। বিশ্বনাথ বাবা তাই করিবার পর তাহার জ্বর এত বাড়িয়া গেল যে তখন আর তিনি দাঁড়াইতে পারিতে ছিলেন না, তখন প্রভুজী অপর সন্ন্যাসীদের বলিলেন বিশ্বনাথকে ঐ খানে শুয়াইয়া দুইটা কম্বল চাপা দিয়া ধরিয়া থাক।

সরযু বাবা প্রভৃতি তাহাই করিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ পরে দেখা

গেল যে বিশ্বনাথ বাবার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। তারপর দিন সকালে ডাক্তার আসিয়া বিশ্বনাথ বাবাকে স্নান করিতে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন বিশ্বনাথ বাবা আপনার যে অসুখ করিয়া ছিল তাহা আমার ঔষধে একদিনে সারিতে পারে না নিশ্চয় ইহার পিছনে আপনার প্রভুজীর কৃপা রহিয়াছে। তখন বিশ্বনাথ বাবা সমস্ত ঘটনা ডাক্তারকে বলাতে তিনি বলিলেন আমার অনুমান ঠিক।

নৌকায় দুইজন মাহিনা করা মাঝি ছিল। বিশ্বনাথ বাবা আসিবার কয়েকদিন পর প্রভুজী মলমূত্র ত্যাগ করিবার জন্য যখন কাশীর অপর পারে চড়ায় যাইতেন তখন বিশ্বনাথ বাবা নৌকা লইয়া যাইতেন কারণ তিনি অল্পদিনের মধ্যে নৌকা চালাইতে ভালভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এমন কি অনেক পাকা মাঝিও তাঁহার সহিত পাল্লা দিতে পারিত না।

ঐ সময়ে একদিন হিন্দু ইউনিভার্সিটির কতিপয় ছাত্রদের সহিত নাগোয়া মাঝিদের ও প্রভুজীর নৌকায় যে সমস্ত সন্ন্যাসী ছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে বচসা হইতে হইতে ক্রমশঃ ছাত্রেরা উচ্ছৃঙ্খলার চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়া প্রভুজীর নৌকার উপর ইট ও মাটির ঢেলা ছুঁড়িতে আরম্ভ করিলে ঐ বজরায় যাহারা ছিলেন তাঁহারা (এমন কি কিছু ভক্তও) আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন প্রভুজী বলিলেন এখানে আর থাকা উচিত নয় এই মুহূর্তে অসি ঘাটে নৌকা লইয়া চল।

প্রভুজীর আদেশে বজরা অসি ঘাটে পৌঁছাইলে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য ও কয়েক জন অধ্যক্ষ উক্তঘাটে প্রভুজীর বজরায় আসিয়া করজোড়ে প্রভুজীকে বলিলেন, প্রভুজী ছাত্রেরা অদ্য যে আচরণ

করিয়াছে তাহার জন্য আমরা অনুতপ্ত হইয়াছি। তাহারা এখন বালক আপনি তাহাদের ক্ষমা করুন ও পুনরায় নাগোয়াতে চলুন, প্রভুজী বলিলেন, আমার মুখ থেকে একবার যাহা বাহির হয় পুনরায় আর তাহা প্রত্যাহৃত হইতে পারে না। রামজী বালকদের ক্ষমা করিয়াছেন। বালকদের বলিবার কিছু নাই। তবে তোমাদের বলিতেছি এই রকম বিশৃঙ্খলাযুক্ত ছাত্রদের জন্য এত টাকা খরচ করিয়া গুরুকুল করার কোন প্রয়োজন তো দেখি না। ঐ টাকা দেশের অনেক সৎ কাজে লাগিতে পারিত। তখন পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য সমেত অধ্যক্ষেরা বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যান।

আর কিছুদিন পরে পুনরায় মালব্য ইত্যাদি কয়েকজন ভক্ত আসিয়া প্রভুজীকে বলেন, প্রভুজী এখন আপনার অনেক বয়স হইয়াছে বজরায় থাকিয়া আপনাকে বহু কষ্ট পাইতে হয় অতএব আপনি আদেশ করুন, এই গঙ্গার ধারে আপনার জন্য একটি পাকা ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিব। প্রভুজী তখন অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, কি তোরা তুলসীদাসের নাম কাশী হইতে উঠাইয়া দিতে চাস। আর আমাকে লোভ দেখাইতে আসিয়াছিস। আমার নেবার মতন তোদের কাছে কেন এজগতে কাহারও নিকট কিছু নাই, যদি প্রকৃত সৎ কাজ করিতে চাস ঐ পোড়ো তুলসী ঘাট নূতন করিয়া দে। তখন পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, জি, ডি বিড়লা ইত্যাদিকে ধরিয়া নূতন তুলসী ঘাট তৈয়ারী করাইয়া দেন। তারপর প্রভুজীর মত লইয়া বজরখানি নূতন করিয়া দেন।

সন্ন্যাসী গুরু ভাইদের পরমহংস বিশ্বনাথ বাবার উপর কুদৃষ্টি দিন

দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং নানারকম বিরুদ্ধ আলোচনা চলিতে লাগিল। প্রভুজী জানিতে পারিয়া নানা রকম ভাবে প্রমান করিয়া দিলেন যে বিশ্বনাথ বাবার বয়স অল্প হইলেও অন্য সকলের চাইতে সে। যে কোন বিষয়ে বহুগুণে জ্ঞাণী ও গুণী। একটি ঘটনা আপনাদের জানাইতেছি। ইহার পর একদিন তিনি তাহার সন্ন্যাসী শিষ্যদের বলিলেন কেন তিনি বিশ্বনাথ বাবাকে বেশী ভালবাসেন।

প্রভুজীর গদি পরমহংস গদি, পরমহংস গদির নিয়ম, কোন সন্ন্যাসী ভিক্ষা করিতে পারিবেনা। পরের দিনের জন্যও কোন জিনিষ গচ্ছিত রাখিতে পারিবেনা। সুতরাং অতিরিক্ত জিনিষ যাহা থাকিবে অন্য ভক্তদের ও গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে।

সমস্ত সন্ন্যাসী শিষ্যের উপর পরীক্ষা শুরু হইল। প্রভুজী মায়ার দ্বারা এমন করিলেন যে সেদিন বজরায় কোন খাবার ও ভক্তেরা আসিল না। এমন কি রাজবাড়ি হইতে প্রভুজীর জন্য নিত্য যে ভোগ আসিত তাহাও আর সেদিন আসিল না। ঠিক সন্ধ্যার পূর্বে প্রভুজী বিশ্বনাথ বাবার সঙ্গে স্নান সারিয়া বেশ খানিকটা গঙ্গাজল খাইলেন। প্রভুজী মুখে কিছু না দিলে বিশ্বনাথ বাবা জলগ্রহন করিতেন না। সেই কারণে প্রভুজী গঙ্গাজল খাইবার পর বিশ্বনাথ বাবাও মনের আনন্দে খানিকটা গঙ্গা জল খাইলেন। দ্বিতীয় দিনও ঐরূপ কাটিল। তৃতীয় দিনে দুই এক জন সন্ন্যাসী প্রভুজীকে বলিলেন আপনি রোজ উপবাস থাকিবেন। আপনার জন্য আমরা ভিক্ষা লইয়া আসি। তাহাদের উপর আদেশ হইল আভি নিকাল যাও অর্থাৎ এই মুহূর্ত্তে এই স্থান হইতে বাহির হইয়া যাও।

যাহার কষ্ট হইবে সে বজরার বাহিরে যাইতে পারে। অন্যের জন্য ভাবিবার কোন প্রয়োজন নাই। চতুর্থদিনে দেখা গেল বিশ্বনাথ বাবা ও সরযু বাবা ছাড়া সকলেই বজরার বাহিরে গিয়াছে ও ভিক্ষা লইতেছে। পঞ্চম দিনে দিনে দেখা গেল সরযুবাবা প্রভুজীর পায়ের উপর পড়িয়া বলিতেছেন, প্রভুজী পেটতো আর শুনিতেছে না। আমার উপর এরূপ পরখ কেন? প্রভুজী আমিতো বিশ্বনাথের উপর হিংসা করিনা। এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিবে জানিয়াই প্রভুজী চালাকি করিয়া বিশ্বনাথ বাবাকে কোন কাজের অছিলায় একটু দূরে পাঠাইয়াছেন।

প্রভুজী বলিলেন, সরযু বেটা আমি জানি, তুই বিশ্বনাথকে ছোট ভাইয়ের মতন ভালবাসিস ও জায়গা বিশেষে তাহার কর্ম্মানুযায়ী উহাকে বড় ভাইয়ের মতন সম্মান দিয়া থাকিস। তাছাড়া তুই আমার কাছ হইতে যে কৃপা লাভ করিয়ছিস আমি জানি তুই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবি। কিন্তু নিয়মের বাহিরে কিছু করিতে পারি না। তুই এক কাজ কর, উহাদের মতন বাহিরে ভিক্ষায় যাইতে হইবে না বজরা হইতে নামিয়া কাছাকাছি কোথাও গিয়া বসিয়া থাক। সরযুবাবা তাই করিলেন দেখা গেল কোথা হইতে এক ভক্ত মহিলা আসিয়া তাঁহাকে জোরপূর্বক কিছু খাওয়াইয়া গেল। ষষ্ঠ দিনও নৌকায় ঐভাবে কাটিল। সপ্তম দিনে পরীক্ষা শেষ ও বিশ্বনাথ বাবার সমস্ত গুরু ভাইয়েরা মিলিয়া প্রভুজীর কাছে নিজেদের দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। প্রভুজী বলিলেন মেরা বিশ্বনাথ তেরা পরীক্ষা আজ শেষ। সেই মুহূর্ত্তে দেখা গেল ভক্তেরাও রাজ বাড়ী হইতে প্রভুজীর ভোগ আসিতেছে।

বিশ্বনাথ বাবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রভুজীর আদেশে তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইলেন। কয়েকদিন তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া পুনরায় মহাতীর্থে অর্থাৎ প্রভুজীর শ্রীচরণে ফিরিয়া আসিলেন ও পুনরায় প্রভুজীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। ঐ সময়ে পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ বাবার ভগ্নি প্রভুজীর কাছে দ্বার সন্ন্যাস লইয়া বৃন্দাবন ইত্যাদি ঘুরিয়া আসিয়া কাশীতে উঠিলেন। এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাশীতে কাটাইয়া ছিলেন।

ইহার পর প্রভুজী নিজে কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই। প্রভুজীর আদেশে বিশ্বনাথ বাবাই দীক্ষা দিতেন। বিশ্বনাথ বাবাকে কেহ প্রণাম করিতে যাইলে, তিনি প্রণাম লইতেন না এবং বলিতেন এখানে প্রভুজীকে ছাড়া আর কাহাকেও প্রণাম করিতে হইবে না। এমনকি যখন তিনি দীক্ষা দিতেন সেই দীক্ষিত শিষ্যেরা প্রণাম করিতে যাইলেও বলিতেন প্রণাম তোমরা প্রভুজীকে করিবে। কারণ আমি তাঁহারি আদেশে তোমাদের মন্ত্র দিতেছি। আসলে তোমাদের গুরু হচ্ছেন প্রভুজী।

ঐ সময়ে প্রভু বিশ্বনাথ বাবার পিতা ঠাকুর মহাশয় (কানাইবাবু) কয়েকজন গ্রামবাসীর সহিত বদ্রীনারায়ণ তীর্থে যাইবার পথে কাশীতে প্রভুজী ও প্রভূ বিশ্বনাথ বাবার সহিত দেখা করেন। অল্প কিছু দূর যাইবার পর হঠাৎ কানাইবাবু এক চটিতে অসুস্থ হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে চটিতে রাখিয়া পুনরায় যাত্রা করেন। কানাইবাবু তখন চিন্তিত হইয়া পড়েন। ঐ সময় ইণ্টালী বেনিয়াপুকুর নিবাসী ধীরেন দত্ত মহাশয় (যিনি এখন

সন্ন্যাস ধর্ম লইয়া দেওঘরে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে আছেন) উক্ত চটিতে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন কানাই বাবু তাহাকে বলিলেম, বাবা আমি বদ্রীনারায়ণের যাত্রী পথে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি। আমার সঙ্গীরা (যাহারা সঙ্গে আসিয়াছিল তাহারা) আমাকে এই চটিতে রাখিয়া পুনরায় যাত্রা করিয়াছে। আমার কাছে টাকা যথেষ্ট আছে। তুমি যদি দয়া করিয়া আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া যাও তাহলে এ ব্রাহ্মন তোমার কাছে চিরঋণ থাকিবে। দত্ত মহাশয় বলিলেন আপনি ব্রাহ্মণ ও আমার পিতার বয়সী আপনার কোন কাজ করিতে পারিলে নিজেকে ধন্য বলিয়া মনে করিব। আপনি কিছু ভাবিবেন না আমি যে কোন উপায়ে আপনাকে বদ্রী-নারায়ণ দর্শন করাইব। দত্ত মহাশয় সমস্ত ব্যবস্থাদি করিয়া কানাই বাবুকে বদ্রীনারায়ণে লইয়া যান। কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়া বিপদে পড়েন। পাণ্ডারা কিছুতেই রুগীকে লইয়া মন্দিরে ভিতরে যাইতে দিবেন না। দত্ত মহাশয়কে আমি বাল্যকাল হইতে জানি, তিনি ভীষণ জেদী লোক যেটা ধরিবেন সেটা শেষ না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না। তিনি তখন দল পাকাইয়া পাণ্ডাদের মত ঘুরাইয়া দেন, অবশ্য এর জন্য তাহাকে কিছু অর্থ খরচ করিতে হইয়াছিল।

মন্দিরের ভিতর গিয়া পূজা করিয়া বদ্রীনারায়ণে ও মন্দির পরি-ক্রমার পর কানাইবাবু বলিলেন, এই মুহূর্তে আমাকে এখান হইতে লইয়া চল, আমি মন্দির অপবিত্র করিতে চাইনা। তৎক্ষণাৎ তাহাকে মন্দিরের বাহিরে লইয়া যাওয়া হইলে, তিনি দত্ত মহাশয়কে বলিলেন, বাবা আমার একমাত্র ছেলে কাশীতে সন্ন্যাস ধর্ম লইয়া

শ্রীশ্রীহরিহর বাবার বজরায় আছে, উপস্থিত তাঁহার নাম পরমহংস শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ বাবা, পারতো তাহাকে পরে খবর দিয়ো, আর আমার শেষ কাজ তুমি করিলেও কোন আপত্তি নাই, এই কথাগুলি বলিয়া কয়েক মিনিট চুপ করিয়া থাকিবার পর একবার মাত্র ওঁ উচ্চারণ করিয়া বদ্রীনারায়ণ প্রাপ্ত হইলেন। দত্ত মহাশয় সেই মুহূর্ত্তে কাশীতে প্রভু বিশ্বনাথ বাবার কাছে তার (টেলিগ্রাম) করিয়া দেন। কিন্তু পাহাড়ে হঠাৎ বৃষ্টি নামার জন্য প্রভু বিশ্বনাথ বাবা ঠিক সময়ে আসিয়া পৌঁছাইতে পারেন নাই। দত্ত মহাশয় কানাইবাবুর সমস্ত শেষ কার্য্যাদি করিয়া এই স্থান ত্যাগ করিবার কয়েক ঘণ্টা পরে প্রভু বিশ্বনাথ বাবা শ্মশানে আসিয়া পৌঁছান। অবশ্য পরে কলিকাতায় ও কাশীতে প্রভু বিশ্বনাথ বাবার সহিত দত্ত মহাশয়ের দেখা হইয়াছিল।

ইহার পর প্রভুজীর দেহ ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। মলমুত্র ত্যাগের জন্য তাঁহাকে আর নৌকা করিয়া অপর পারের চড়ায় লইয়া যাওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল, তখন প্রভুজী বেশীর ভাগ সময় বেহুঁস হইয়া থাকিতেন। মলমুত্র ত্যাগ করিবার সময় বলিতেন বিশ্বনাথ এখন আমি কোথায় ? প্রভু বিশ্বনাথ বাবা চক্ষু বুজিয়া বলিতেন মেরে গোপাল এখন আমরা ব্যাস কাশীতে। তখন প্রভু বিশ্বনাথ বাবা বজরায় মাটির সরা ও মালসা আনাইয়া রাখিতেন। উক্ত পাত্রে প্রভুজী মলমুত্র ত্যাগ করিলে তিনি ঐ পাত্র নিজ হাতে করিয়া ব্যাস কাশীতে ফেলিয়া আসিতেন। কোন দিন ভুলিয়াও কাশীতে বা গঙ্গার জলে ফেলেন নাই।

এই রকম কিছুদিন কাটিবার পর প্রভূজী তাঁহার শিষ্যদের, মহা-

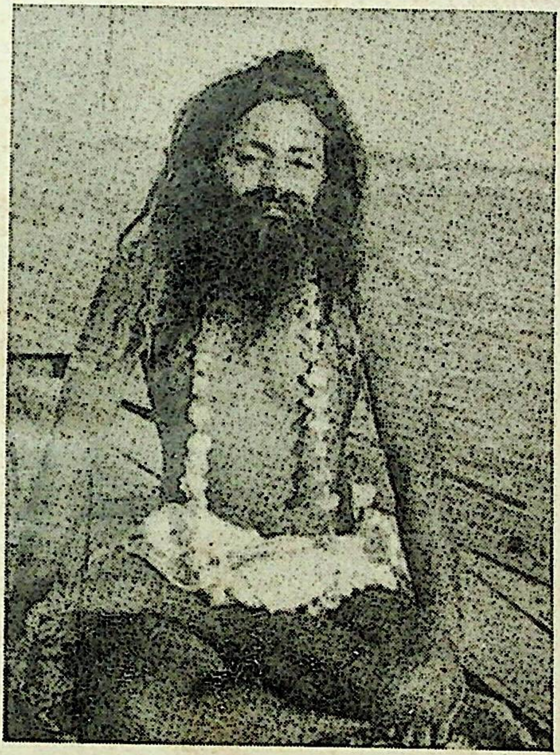

পরম হংস শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ বাবা

রাজ সোবেল, মহারাণা স্নুরগুঞ্চা, বিশিষ্ট বিশিষ্ট শিক্ষিত, পণ্ডিত ও ভক্তবৃন্দের সামনে প্রভু বিশ্বনাথ বাবাকে গদিতে বসাইয়া বলিলেন, আর আমার শরীর রাখিবার কোন আবশ্যক নাই। কারণ জগৎ উদ্ধার করিবার জন্য আমার সম্পূর্ণ শক্তি বিশ্বনাথকে দিয়া গেলাম, অন্তিমে এই আশিস একমাত্র বিশ্বনাথ পাইবার উপযুক্ত বলিয়া আমি মনে করি। তারপর প্রভু বিশ্বনাথ বাবার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, মেরা বিশ্বনাথ, তুই রাজা বিশ্বনাথ, তুই স্বয়ং কাশীর বিশ্বনাথ, তবুও তোকে একবৎসর নানারূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, পুনরায় এক-বৎসর পরে অবশ্য তোর ইচ্ছায় ছুনিয়ার শান্তি হইবে।

১লা জুলাই, ১৯৪৯ সাল শুক্রবার রাত্রি ১১-৩০মিঃ কাশীতে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। তারপর দিন সকাল হইতে না হইতে চারিদিক হইতে লোক আসিতেছে, রেল ষ্টেশনে, মেয়াঘাট যেখানে জিজ্ঞাসা কর, সর্বত্র এক কথা যাবো, অসিঘাট, অসিঘাটে ধুলা ছাড়া আর কিছু দেখা যাইতেছেনা। গংগার অপর পাড় হইতে মনে হইতেছিল, যেন অসিঘাটে আগুন লাগিয়াছে।

প্রভুজীর দেহত্যাগের পূর্বের নির্দ্দেশানুযায়ী পরমারাধ্যে বিশ্বনাথ বাবা একটি পাথরের বাক্সে প্রভুজীর দেহ স্থাপন করিয়া তৎপরে ঐ বাক্স নৌকায় করিয়া অসি হইতে বরুনা অবধি পঞ্চকোশী ইত্যাদি সমস্ত জায়গা প্রদক্ষিন করাইয়া শেষে মণিকর্ণিকায় উহা নিক্ষেপ করিলেন। প্রভুজীর দেহত্যাগের পর কাঁশীতে ছুই দিন পূর্ণ হরতাল পালন হইয়াছিল।

তারপর বজরার অবস্থা কি হইল সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ

করিলে পাঠকদের হয়তো ভুল বশতঃ সমস্ত সন্নাসী সম্প্রদায়ের উপর বীতশ্রদ্ধা আসিতে পারে। সেই কারণে সম্পূর্ণভাবে না লিখিলেও, কিছুটা জানাইতে বাধ্য হইলাম, নচেৎ সত্যের অপলাপ করা হইবে।

পাঠকেরা পূর্বে প্রভুজীর দেহ থাকা কালীন প্রকৃত সত্য ঘটনা অবগত আছেন। এক্ষণে আবার পরমহংস শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ বাবার সন্ন্যাসী গুরুভাইদের ভিতর অনেকের পুরানো বাসনা জাগিয়া উঠিল। তখন প্রভূর বজরার কাছে আসিয়া বলিল, আমরা পুরানো শিষ্য অতএব এ গদি আমাদের প্রাপ্য।

প্রভুজীর দেহত্যাগের পর পরমহংস বিশ্বনাথ বাবা দিনান্তে একবার মাত্র মলমূত্রত্যাগ ও দুইবার স্নান করিবার জন্য ব্যতীত আর বজরার বাহিরে আসিতেন না, তাঁহার কানে একথা পৌঁছিবামাত্র তিনি বজরার বাহিরে আসিয়া বলিলেন, দেখ আমি তোমাদের চাইতে ছোট কি বড় সে সিদ্ধান্তে যাইতে চাহিনা, তোমাদের স্পষ্ট-ভাবেই বলিতেছি এ গদিতে বসিবার লোভ আমার নাই বরং তোমরা কেহ বসিলে আমার পক্ষে ভালই হয়। অতএব তোমরা দলাদলি না করিয়া এ গদিতে কে বসিবে নিজেদের মধ্যে ঠিক কর আমি নিজে তাহাকে এই গদিতে বসাইয়া দিব, এমনকি যদি আমাকে এইস্থান ছাড়িয়া যাইতে বলো, তাহাতেও আমি রাজী আছি। তখন বিশ্বনাথ বাবার ভক্তেরা অনেকেই মনক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেল, কেহ বা সরযুবাবার খোঁজে বাহির হইল। আবার কেহবা প্রভুজী যাহাদের সামনে প্রভু বিশ্বনাথবাবাকে গদিতে বসাইয়াছিলেন তাহাদের খোঁজে বাহির হইল। এ ধারে যাহারা দল পাকাইয়া

আসিয়াছিল তাহাদের ভিতর তীব্র বাদানুবাদ চলিতে লাগিল, কে তাহাদের ভিতর গদিতে বসিবে? শেষ অবধি যখন হাতাহাতি হইবার উপক্রম ঠিক সেই সময় শ্রীশ্রীসরযুবাবা একটি লাঠি সমেত সেখানে উপস্থিত হইলেন, তখন সকলে সরযূবাবাকে ঐরূপে লাঠি হস্তে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত ভয় পাইয়া একসঙ্গে বলিতে লাগিলেন, সরযু ভাইয়া যদি গদিতে বসে তাহা হইলে আমাদের কাহারও আপত্তি নাই, কারণ সে আমাদের সকলের চেয়ে বয়সে ও সন্ন্যাসে বড়। সরযুবাবা নিজে সমস্ত শুনিয়াও উদাসীন রহিলেন।

তিনি পৌঁছিয়া লাঠিটি ঈষৎ উচ্চ করিয়া বলিলেন, প্রভুজী যে গদিতে বিশ্বনাথকে বসাইয়া গিয়াছেন সে গদি হইতে বিশ্বনাথ বাবাকে হটাইয়া কে বসিতে চায়? তখন সকলে চুপ, কাহারোও মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না দেখিয়া, সরযু বাবা পুনরায় বলিলেন এখন চুপ হয়ে গেলি কেন? এর আগে তো কুকুরের মতন ঘেঁউ ঘেঁউ করিতে ছিলিস। তোরা যদি এই মুহূর্তে এইস্থান হইতে না যাস তার ব্যবস্থা এই লাঠি করিবে। গতিক সুবিধা নয় দেখিয়া সকলেই স্বস্থানে গমন করিলেন।

তারপর পরমহংস বিশ্বনাথ বাবার কাছে গিয়া বলিলেন, বিশ্বনাথ ভাইয়া এখন দুচার দিন এখানে আমাকে থাকিতে হইবে।

প্রভূ বিশ্বনাথ বাবা বলিলেন, "মোটকা ভাইয়া এ সমস্ত প্রবঞ্চনার মধ্যে আমার আর ভাল লাগে না। তুমি নিজে কিংবা যাহারা এ গদিতে বসিতে চাহিতেছে তাহাদের ভিতর কাহাকেও বসাও।"

তখন সরযুবাবা রাগান্বিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন প্রভূজী

তোমায় এ গদিতে বসাইয়া গিয়াছেন আর তুমি যদি ঐ কুকুরগুলির ভয়ে তোমার অধিকার ছাড়িয়া চলিয়া যাও, তাহা হইলে জানিব যে তোমার চেয়ে কাপুরুষ কাশীর ভিতর আর কেহ নাই, আর ইহাও মনে রাখিও প্রভুজীর কাছ হইতে যে কার্যের ভার লইয়াছ, সে কার্য করিবার সৌভাগ্য আর কোন জীবনে পাইবে কিনা সন্দেহ।

তখন বিশ্বনাথ বাবা বলিলেন যেখানেই যাই না কেন প্রভূজীর বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে পারি না, কারণ এ দেহ মন সব কিছুই প্রভূজীর। মোটকা ভাইয়া প্রভূজী ছাড়া দুনিয়ায় কি কিছু আছে।

তখন সরযুবাবা গলার স্বর একটু নিম্ন করিয়া বলিলেন, ওসব শুনিতে এখানে আসি নাই, আমার মত ছাড়া তুমি এখান হইতে যাইতে পারিবে না এবং কাহাকেও এখন কোন মতামত প্রকাশ করিবে না।

প্রভুজী দেহ রাখবার সময় বলিয়াছিলেন, "বিশ্বনাথ তুই রাজা তোকে এক বৎসর খুব কষ্ট পাইতে হইবে দেখা গেল তাহাই হইতেছে এমন দিন গেছে যে প্রভু বিশ্বনাথের পেটে কিছুই পড়ে নাই সন্ধ্যার পূর্বে প্রভুজীকে স্মরণ করিয়া গংগার জল খাইয়া দিন কাটাইয়াছেন।

একদিন সরযুবাবা চিন্তিত মনে গঙ্গার চড়া দিয়া বজরার দিকে আসিবার সময় মনে মনে ভাবিতেছিলেন প্রভুজী বিশ্বনাথ বাবার উপর এখনও পরখ করিতেছেন অথচ তিনি নিজে বলিয়াছিলেন সর বিশ্বনাথ আসলি বিশ্বনাথ ও শিব হইয়া গিয়াছে। অথচ তাঁরই আজ দুই-তিন দিন ধরিয়া কিছু খাবার খাওয়া হয় নাই বলিলেই হয়। সেই মুহূর্তে দেখিতে পাইলেন একজন মহিলা থালা হস্তে বজরা হইতে

নামিতেছেন। মহিলাটিকে সাধারণ বলিয়া মনে হইল না। তখন তিনি তাড়াতাড়ি হাঁটিতে শুরু করিলেন, কিন্তু কাছে পৌঁছিবার পূর্বেই মহিলাটি জলমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। তখন তাড়াতাড়ি নৌকার উপরে উঠিয়া দেখিলেন যে প্রভু বিশ্বনাথ বাবা হাঁসিতেছে, তখন সরযুবাবা বলিলেন, বিশ্বনাথ ভাইয়া আজ মেরা সৌভাগ্য। আগে যাহা প্রভুজীর মধ্যে দেখিয়াছিলাম আজ তোমার মধ্যেও তাহা দেখিলাম। তখন বিশ্বনাথ বাবা বলিলেন মোটকা ভাইয়া তোমার শির খারাপ হইয়াছে। পুনরায় বলিলেন অন্য কাহাকে এ বিষয় কিছু বলিও না। নানারকম অসুবিধা হওয়া সত্ত্বেও প্রভুজী থাকিতে নিত্য যেমন রামায়ন পাঠ, রামনাম সংকীর্ত্তন ও ধর্ম আলোচনা হইত, তখনও ঠিক সেইভাবে চলিতে লাগিল। এক বৎসর হইলে প্রভু বিশ্বনাথ বাবা এত জাঁকজমকের সহিত প্রভুজীর আরাধনা তিথি উৎসব করিলেন যে সকলে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল।

তারপর প্রভুজীর কথানুযায়ী বজরায় অবস্থা ফিরিল ও নিত্য দলে দলে ভক্তের সমাগম হইতে লাগিল। নিত্য নামকীর্ত্তন, ভজন, ও নানারকম সৎগ্রন্থ পাঠ বিশেষতঃ যোগাবিশিষ্ট রামায়ন পাঠ ও রামধূন পাঠ হইতে লাগিল। এখন প্রভুজীর কথানুযায়ী সকলেই মানিতে বাধ্য হইল অসিঘাটের বিশ্বনাথ, রাজা বিশ্বনাথ, কাশীর আসল বিশ্বনাথ।

প্রভু বিশ্বনাথ বাবা চিত্রকুট পাহাড় দর্শনার্থে যাত্রা করেন তাঁহার সহিত জমিদার বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও একজন কাশীর বিদ্যার্থী (বি, এস, সি পড়িতেছিলেন) শ্রীরবি দাস ছিলেন। একদিন

সায়ংকালে মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া পুরাতন তুলসীঘাটে যখন শ্রীরাম চন্দ্রজীকে দর্শন করিতেছিলেন সেই সময় তিনি ভাবাবেশে ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরিলে দেখিলেন, এক বৃদ্ধ মহাপুরুষ আসিয়া বলিলেন "আপ শিব রূপ হইয়া দর্শন দেনেকো আসিয়াছেন। আপনা আসন পর যাইয়ে—আপনা স্থান ছাড়িয়া কোথাও যাইবেন না" এই কথাগুলি দুইবার বলিয়া সেখান হইতে অন্তর্ধান হইলেন।

তারপর বিশ্বনাথ বাবা কাশীতে ফিরিয়া আসেন, তখন দেখা গেল সকাল হইতে রাত্রি অবধি বজরায় লোক সমাগমের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। তাঁহার শ্রীমুখেব মধুর বাণী, জীবনির্বিশেষে প্রেম ও তাঁহার শিক্ষানীতি শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। এই সময় প্রভু বিশ্বনাথ বাবার ভগিনী শ্রীমতি কালীদেবী যিনি প্রভুজীর কাছে দ্বার সন্ন্যাস দীক্ষা লইয়াছিলেন। তিনি কাশীতে দেহ রক্ষা করেন অর্থাৎ কাশী প্রাপ্ত হন।

তারপর তিনি দুইবার কলিকাতায় আসিয়া হাওড়ায় সরোজেন্দু বাবুর বাটীতে উঠিয়াছিলেন ও দুইদিনের জন্য নিজের জন্মস্থান অর্থাৎ কামদেবপুরে গিয়াছিলেন ; এবং ঐ গ্রামের জনকল্যানার্থে গ্রাম্য স্কুলে ও দেবতার মন্দিরের জন্য কিস্তু স্থাবর ও অস্থাবর জমি দান করিয়াছিলেন।

পুনরায় কাশী গিয়া কিছুদিন থাকিবার পর পুনর্বার তীর্থ পর্যটনে বহির্গত হন। কয়েক জায়গা ঘুরিবার পর তিনি শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রজী দর্শনার্থে বৃন্দাবনে যান।

সেই স্থানে গিয়া তিনি শুনিলেন, বৃন্দাবনে সেবাকুঞ্জে যে ব্যক্তি রাত্রিবাস করে সেই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। আশ্বিন মাসে পূর্ণিমার রাত্রে সেবা কুঞ্জে গিয়া একান্তে ধ্যানে মগ্ন হইলেন। তারপর ধ্যানস্থ অবস্থায় জানিতে পারিলেন যে বর্তমানে বৃন্দাবনবিহারী নিত্য ঐ স্থানে রাসলীলা করেন। তারপর রাত্রে ধ্যান ভগ্ন হইলে যখন তিনি রাম নাম করিতে ছিলেন, ঠিক ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের কিছু পূর্বে দেখিতে ও শুনিতে পাইলেন যেন স্বয়ং ভোলানাথ, মাতা অন্নপূর্ণা ও গনপতি সমেত আসিয়া তাহাকে আদেশ করিতেছেন, "এই মুহূর্ত্তে কাশী ফিরিয়া যাও।" প্রভু বিশ্বনাথ বাবা তাঁহাদের প্রণাম করিয়া সেবাকুঞ্জ হইতে বাহিরে আসিলেন ও সেইদিন পুনরায় কাশীতে ফিরিয়া যান। ঐ সময় প্রভু বিশ্বনাথ বাবার এক শিষ্য তাহার কন্যা সমেত বজরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু ও শিষ্যে যখন ধর্মালোচনা চলিতেছিল সেই সময় ঐ শিষ্যের কন্যাটিও কাঁদিতেছিল। তখন প্রভু কন্যাটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিরে বেটি কাঁদছিস কেন? তখন ঐ শিষ্যটি বলিল, বাবা ঐ জন্যেইতো এইস্থানে কন্যাটিকে লইয়া আসিয়াছি। ঠিক সময়ে ওর বিবাহ দিয়াছিলাম। কিন্তু এমন ওর ভাগ্য যে এখনও অবধি উহার কোন সন্তান হয় নাই। সেই কারণ বশতঃ এখন প্রায় সব সময়ে ঐ রকম কাঁদিয়া থাকে। তখন প্রভু বলিলেন, তা আমায় এতদিন বলিস নাই কেন? তারপর প্রভু ঐ শিষ্যের কন্যার পিঠে একটি চাপড় মারিয়া বলিলেন যা বেটি তোর

সংসার বৃক্ষমারাঢ়াঃ পতন্তিণর কার্ণবে।—

যেনে হ্যত মিদং বিশ্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

একটা পুত্র হইবে। তার ঠিক দশ মাস পরে ঐ মহিলার একটি পুত্র হয়।

কিছুদিন বেনারসে থাকিবার পর প্রভু পুনরায় তাঁহার এক শিষ্য ঢাকুরিয়া ষ্টেশন রোডের শ্রীদীনেশ চন্দ্র গাঙ্গুলী ও তাহার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা সমেত হরিদ্বার, ঋষিকেশ, ডেরাডুন ও মুসৌরীর পাহাড় ঘুরিয়া আসেন। দীনেশ বাবু ও তাহার স্ত্রী আমাকে বলিয়াছিলেন, যে ঐ সময় প্রভুকে মনে হইত যেন পাঁচ বছরের বালক।

প্রত্যেক বৎসর প্রভু বিশ্বনাথ বাবা খুব জাঁকজমকের সহিত প্রভু-জীর আরাধনা তিথি উৎসব করিতেন কোথা হইতে এত জিনিষপত্র ও টাকা আসিত প্রভু বিশ্বনাথ ছাড়া কেহ জানিত না। আমি এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীসরযু বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন বিশ্বনাথ বাবাকো বাত ছোড় দেও ও পূর্ণ শিব অবতার থা, ও যা মনে করিত মা অন্নপূর্ণা নিজে ওকে পৌঁছে দিয়ে যেতেন। এবারেও উৎসব উপলক্ষে পূর্ব বৎসরের ন্যায় এক সপ্তাহ পূর্ব হইতে ভক্তের সমাগম হইতে লাগিল। দশ-বারো খানি বাহিরের বজরাও পূর্ব হইতেই ভাড়া করা হইয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য বৎসরের ন্যায় টাকা ও জিনিষপত্র আসিতেছেনা দেখিয়া মুরুব্বি শিষ্যেরা একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু প্রভু বিশ্বনাথ বাবাকে কোন রকম উতলা হইতে দেখা যাইত না। এই ভাবে দুইদিন কাটিবার পর ঠিক উৎসবের দুইদিন পূর্বে সকাল বেলায় মুরুব্বি শিষ্যেদের ভিতর দুই-তিন জন প্রভুর নিকটে গিয়া বলিলেন, বাবা এখনও অবধি কোন

টাকা বা সামান আসে নাই। কি করা যায়? প্রভু বলিলেন যাঁর ভাবনা তাহাকে ভাবিতে দাও। তোমরা তোমাদের কাজ করিয়া যাও সময়ে সব হইবে।

উৎসবের আগের দিন সকাল বেলায় শিষ্যদের সেই চিন্তা কি উপায়ে এই কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে? বিশ্বনাথ বাবা কিন্তু অচল অটল। হঠাৎ ৯টার পর হইতে দেখা গেল ভারে ভারে নানারকম সামান আসিতেছে। তাহা ছাড়া অনেকে প্রভু বিশ্বনাথ বাবাকে টাকা দিয়া প্রণাম করিতেছে। বেলা ১২টার পর এক পিওন আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিয়া বলিল, বাবা, অনেকগুলি মনিঅর্ডার আছে এগুলো কি আপনি নিজেই সহি করিবেন? প্রভু বলিলেন দাও, সমস্তগুলি সই করিবার পর ঐস্থানে উপস্থিত এক শিষ্যকে দেখাইয়া পিওনকে বলিলেন, উহাকে টাকা বুঝাইয়া দাও। দেখা গেল অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর উৎসব ভালোভাবেই হইল। প্রভুর এই সমস্ত লীলা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাহাদের ভাগ্যবান বলিতে হইবে।

আমার মহাপুরুষের কৃপালাভ

আমার এক বন্ধু শ্রীসুকুমার চন্দ্র ঘোষ একদিন আমাকে বলিলেন, অমিয়বাবু বালিগঞ্জে রাসবিহারী এভিনিউ রাস্তার উপর যে রাধা-গোবিন্দের মন্দির আছে সেখানে একজন যথার্থ মহাপুরুষ আসিয়াছেন, প্রয়োজন বোধ করিলে আপনি দেখিয়া আসিতে পারেন। আমি বলিলাম আজ আমার শরীরের অবস্থা ভাল নয়। যদি ভাল

থাকি তবে কাল যাইবার চেষ্টা করিব। এর আগে অনেক মহাত্মার কথা শুনিয়াছি বা দেখিয়াছি। কিন্তু এবারে এক মাহাত্মা আসিয়াছেন শুনিবামাত্র আমার ভিতর হইতে যেন কে বলিতেছে, 'যা দেখে আয়' সারারাত্রি আমার ঐ চিন্তায় কাটিল। তারপর দিন সকালে উঠিয়া নিত্যকার্য্যাদি সমাপন করিয়া যথা সময়ে অফিসে যাইলাম। অফিসেও সেই এক চিন্তা, মনকে এত চঞ্চল করিয়া তুলিল যে, কোন কার্য্যে মন দিতে পারিলাম না। বেলা দুই ঘটিকার সময় আমার অফিসারকে বলিলাম, আমার মনটা আজ বড় চঞ্চল, বাড়ি যাইব মনে করিতেছি, তিনি বলিলেন, আচ্ছা যান। তারপর বাড়ীতে গিয়া হাত-পা ধুইয়া, অফিসের জামাকাপড়াদি ছাড়িয়া, অন্য বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া ঐ রাধা গোবিন্দ মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। বেলা তিন ঘটিকার সময় মন্দিরে আসিয়া ঠাকুর দালানে বসিলাম। সেখানে একজন বৃদ্ধ বসিয়াছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কার কাছে দীক্ষা নিয়েছেন? আমি বলিলাম দীক্ষা আমি লই নাই। তিনি বলিলেন, এমন সুযোগ ছাড়িবেন না। আমি বলিলাম, গুরু অন্বেষণে বাহির হই নাই। আমার সময় হইলে গুরু নিজেই শ্রীচরণে ডাকিয়া লইবেন। ঠিক সেই মুহূর্তে দুইজন ভদ্রমহিলা সেইস্থান দিয়া যাইতে -ছিলেন। উপস্থিত দুইজনই আমার গুরুভগ্নী, একজন হচ্ছেন দীনেশ দার স্ত্রী যে দীনেশদা মন, প্রাণ ও অর্থ সব কিছু প্রভু বিশ্বনাথ বাবার শ্রীচরণে নিবেদন করিয়াছেন আর একজন হচ্ছেন ধীর, স্থির, অল্প ও মিষ্টভাষী আমাদের শীতলদার স্ত্রী। বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঐ দুই

জন মহিলাকে বলিলেন বিশ্বনাথ বাবা এখন দীক্ষা দিচ্ছেন তো? তাহারা বলিলেন খুব কম, জিজ্ঞাসা করিতে বলেন তো, করিতে পারি বলিয়াই কিছু বলিবার পূর্বেই ভিতরে গেলেন, এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ ঐ ভদ্রলোককে আগামী কাল আসিতে বলিলেন, আমি তখন মহাপুরুষের দর্শনের জন্য বসিয়া রহিলাম। পাঁচটার পর যথা সময়ে ভিতর হইতে হঠাৎ "হর হর মহাদেব শম্ভু কাশীবিশ্বনাথগঙ্গে" আওয়াজটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসিতেছে শুনিতে পাইলাম, তারপর এক অপূর্ব্ব মুর্ত্তি দেখিলাম, প্রথম দর্শনেই মনে পড়িল আমার বন্ধু যা বলিয় ছিলেন ঠিকই। মহাপুরুষ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন, একে একে সকলে তাঁহার কাছে গিয়া মাটিতে মাথা নীচু করিয়া তাহাকে প্রণাম জানাইল। এতক্ষণ প্রভুর পায়ে কাপড় চাপা ছিল আমি কাছে যাইবামাত্র তিনি পায়ের কাপড় সরাইয়া দিলেন। আমি তখন তাঁহার শ্রীচরণের ধুলি জিহ্বায় ঠেকাইয়া আমার মস্তক তাঁহার শ্রীচরণে ঠেকাইতেই তিনি তাঁহার-কোলের উপর আমার মাথা রাখিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া বলিলেন, "বেটা এতনা রোজ কাহা থা? কাল সুবা ১০ বাজে আও, কালই তোর দীক্ষা হইবে।" তখন পুনরায় তাঁহাব শ্রীচরণে মাথা ঠেকাইলাম। তখন তিনি আমার মাথা তাহার পায়ের উপর রাখিলেন সেই মুহূর্তে মনে হইল যেন সমস্ত শরীরটি জ্বলিয়া গেল, কি রকম জ্বলিল তাহা বোঝাইবার ভাষা আমার নাই, কতকটা

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।—

চক্ষুরুন্মালিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

বৈদ্যুতিক শক লাগার মত কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সমস্ত শরীরটা ঠাণ্ডা হইয়া গেল। তখন আমার খালি মনে হইতেছিল স্বয়ং বিশ্বনাথ কাশী হইতে এ দীনের উদ্ধারের জন্যই বোধ হয় আসিয়াছেন। কিছু পরে তিনি তাহার ডান পাশে আমাকে বসিতে বলিলেন, তারপরে যথাস্থানে বসিয়া একদৃষ্টে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম জটাজুট ধারী রং কাল, হৃষ্টপুষ্ট গড়ন ও পরণে গেরুয়া, কখনও মনে হইতেছিল যেন কাল পাথরের গোপাল মূর্ত্তি, কখনও বা মনে হইতেছিল স্বয়ং ভোলানাথ, কখনও বা মনে হইতেছিল নিশ্চয় কোন দেবতা কারণ মানুষের এত মিষ্ট কথাতো ইতিপূর্বে আর শুনি নাই। "বেটা এতনা রোজ কাঁহা থা, আয় তোর দীক্ষা হবে" এই মিষ্টি কথা কয়টি আমার কানে আরও মিষ্ট হইয়া অনবরত বাজিতে লাগিল, সভা ভঙ্গ হইবার পর তাঁহার অনুমতি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পিতাঠাকুরকে সমস্ত ঘটনা বলাতে তিনি বলিলেন তোর পূর্ব জন্মের সুকৃতি থাকার দরুণ তিনি তোকে দীক্ষা দিতে চাহিয়াছেন। আমার আরও মনে হয় এমন পরমহংস বিশ্বনাথ বাবার জোড়া পাওয়া যাইবে না। হয়তো আর নেই। সারা রাত্রি ঘুম নাই। যতবার ঘুম আসিতেছে ততবারই মনে হইতেছে, বেটা এতনা রোজ কাঁহা থা কাল আয়?

তারপর দিন সকালে উঠিয়া নিত্য কর্ম সারিয়া অফিসে যাইলাম ও ৯টার সময় অফিস হইতে সর্টলিভ লইয়া বালীগঞ্জে গিয়া ঠাকুর বাড়ীতে খানিক অপেক্ষা করিবার পর প্রভু গঙ্গাস্নান সারিয়া ফিরিলেন, আমি গিয়া প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন এসেছিস্

বেটা. তারপর যথা সময় আমাকে কৃপাময় কৃপা করিয়া দীক্ষা দিলেন। প্রভুর সঙ্গে কাশী হইতে একজন ব্রহ্মচারী আসিয়াছিলেন পরদিন প্রভু তাহাকে বলিলেন তুমি কাশীতে বজরায় ফিরিয়া যাও, সেখানে প্রভুজীর সেবা ঠিক মতন হইতেছেনা। এখানে কোন অসুবিধা হইবে না। আমার বেটা আসিয়া গিয়াছে। যেখানেই যাই না কেন. বেটা কমণ্ডুল লইয়া যাইবে। প্রভু প্রাতঃকালে দক্ষিণেশ্বর ও বিকালে বাবুঘাটে স্নান করিতে যাইতেন। প্রথম দিনে প্রভু স্নান করিতে নামিলে আমি তাঁহার কৌপিন ও কাপড় কাচিয়া এবং খড়ম ধুইয়া পাড়ে রাখিলাম, ইহার পর স্নান করিয়া উপরে উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া হাতে খানিকটা গঙ্গা মাটি লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রভু সাঁতার কাটিয়া স্নান সারিয়া উপরে উঠিলেন, তখন আমি তাহার নিকট যাইতেই তিনি বলিলেন বেটা তোম বহুত চালাক হ্যায়, আমি তখন ঐ মাটি প্রভুর পায়ের আঙ্গুলে স্পর্শ করাইয়া একটা এ্যালুমিনিয়ামের কৌটায় রাখিলাম। ঠিক তারপরের শুক্রবারে প্রভু বলিলেন শিব বেটা কাল বেলা তিনটের মধ্যে আসিস। পরদিন তিনটার পূর্ব্বে পৌঁছিয়া প্রভুর শ্রীচরণে ধুলি লইবার কিছু পরে বলিলেন বেটা চল বাবুঘাটে আজ ভাল করে স্নান কর। স্নান সারিয়া ঘাটে উঠিয়া কাপড় ছাড়িবার পর সেখানে আসন পাতিতে বলিলেন, রবীন্দ্র দাস মহাশয় সেদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন, প্রভু তাহাকে গাড়ীর কাছে যাইতে বলিলেন। ইহার পর আসনে বসিয়া

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তাং যেন চরাচরম্। —

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

আমাকে বসিতে বলিলেন এবং ব্রহ্মচারার কি নিয়মে চলা উচিত তাহা বর্ণনা করিলেন ও কাপড় ও কৌপিন গেরুয়া মাটিতে রঙ্গাইয়া পরিতে আদেশ করিলেন, এবং বলিলেন, "যা বেটা তোর ভাগ্য ভাল, এতো জলদি কাহাকেও দিই নাই।

একমাস কয়দিন প্রভুর শ্রীচরণে সেবার অধিকার পাইয়াছিলাম। এই অল্পদিনের ভিতর প্রভুর যে সমস্ত লীলা দেখিয়াছি এ যুগে এরকম দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলেই হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সমস্ত ঘটনাদি দেওয়া অসম্ভব, অল্প কয়েকটি ঘটনা জানাইতে বাধ্য হইলাম। প্রভু যে স্থানে থাকিবেন বা যাইবেন সেইস্থানে যতসংখ্যক ভক্ত আসিবে তাহাদের প্রত্যেককে প্রসাদ দিতে হইবে এই ছিল প্রভুর আদেশ বা নিয়ম। প্রত্যেক রবিবারে ভাণ্ডারা দিতে হইবে, এই আদেশ যে পালন করিতে পারিবে প্রভু সেইস্থানে অর্থাৎ তাহার বাটিতে যাইতেন। বালীগঞ্জে ঠাকুরবাড়ী থাকাকালীন প্রত্যেক রবিবার ও যে কোন সাধারণ ছুটীর দিন পূর্ণ ভাণ্ডারা দেওয়া হইত। শিষ্যদের ভিতর যে হোক একজন ঐ ভাণ্ডারের ব্যয় বহন করিত। অন্য কেউ না করিলে আমাদের দীনেশদা সমস্ত ব্যবস্থা করিতেন। একদিন আমার এক গুরুভাইয়ের ইচ্ছা হইল তিনি খিচুড়ী ভাণ্ডারা না দিয়া লুচী ভাণ্ডারা দিবেন। গুরু-ভাই তার মনের ইচ্ছা আমাদের জানাইলেন এবং আরও বলিলেন (লুচী) পূর্ণ ভাণ্ডারা দেওয়া তাঁহার সামর্থে কুলাইবে না। কেবল-মাত্র গুরুভাই, ভগ্নী ও কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তদের জন্য ব্যবস্থা করিতে

ইচ্ছা করিলেন। তাহাতে আমরা বলিলাম আপনার যখন ইচ্ছা হইয়াছে তাহাই করুন। প্রভুকে বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। এ রবিবারে আর খবরের কাগজে না দিলেই হইবে। সেই ভাবে ব্যবস্থা করা হইলে ঠিক ১১॥০ টায় সময় প্রভুকে ভোগ দিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া যখন ভক্তদের পাতা করা হইতেছিল সেই সময় বাহির হইতে দরজায় ধাক্কা ও গণ্ডগোল শুনিয়া ভিতর হইতে প্রভু বলিলেন, এতো গোলমাল কিসের? তখন শীতলদা প্রভুর কাছে গিয়া বলিলেন যে আমাদের গুরুভাই ও ভগ্নীও জনকয়েকের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে, বাহিরে অত লোকের লুচী তরকারী কুলাইবেনা। তখন প্রভু বলিলেন, কি বলিতেছিস, এক্ষুনি ভাণ্ডারা খুলে দে যত লোক এসেছে প্রত্যেকে যেন প্রসাদ পায়। শীতলদা প্রভুর লীলা ভালভাবেই জানিতেন। তিনি তৎক্ষনাৎ দরজার কাছে গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। আমি তখন দরজার কাছে গিয়া জোড়হস্তে বলিলাম আপনারা ঠেলাঠেলি বা গণ্ডগোল করিবেন না। দরজা যখন খোলা হইয়াছে, তখন সকলেই প্রসাদ পাইবেন।

শীতলদা যখন দরজা খুলিতে যাইতেছিলেন তখন ঠাকুর বাড়ীর ম্যানেজার মহাশয় বারে বারে মানা করিতেছিলেন ও বলিতেছিলেন কুলাইতে পারিবেন না দেখিতেছি একটা অঘটন ঘটাইবেন। এবং দরজা খোলা হইলে তিনি পিছনের দরজা হইতে পলায়ন করিলেন দেখা গেল শেষ অবধি খাবার কিছু পড়িয়া আছে। অথচ সেদিন

স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিৎ সচাবাচরম।—

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

খাবারের যাহা আয়োজন হইয়াছিল তাহার চতুর্গুন লোক খাওয়াতে ঐ অঞ্চলে প্রত্যেকেই আশ্চর্য্য হইয়াছিল বিশেষতঃ ঠাকুর বাড়ীর উক্ত ম্যানেজার মহাশয় বলিয়াছিলেন আপনাদের প্রভু বিশ্বনাথ বাবার মাহাত্ম্য যে আছে অদ্য আমি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম। আর একটি দিনের ঘটনা। আমি নিত্য কর্ম্ম ও মধ্যাহ্নে আহার শেষ করিয়া শ্রীগুরু চরণ দর্শনের জন্য বাড়ী হইতে যাত্রা করিলাম। সেইদিন পূর্ণ হরতাল ছিল। যাইবার পথে যতগুলি বাজার ও ফুলের দোকান পড়িল সবগুলি ঘুরিয়া হতাশ মনে নিজের বিবেককে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। কারণ কেবলই মনে হইতেছিল হায় ভগবান কেন গত কাল একটা মালা কিনিয়া রাখি নাই, লেক মার্কেটের কাছে পৌঁছিয়া মনে হইল একবার লেক মার্কেটটা দেখিয়া যাই, ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম সমস্ত দোকান বন্ধ, তারপর দেখি একটা লোকএক বালতি জল লইয়া ফুলের স্টলের দিকে যাইতেছে। আমিও তাহার পিছু লইলাম এবং যাহা ভাবিয়া ছিলাম তাহাই হইল। উক্ত ভদ্রলোক দোকন খুলিয়া ফুলে জল দিতে লাগিলেন। অমি তাহার কাছে যাইয়া জোর হাত করিয়া বলিলাম, মহাশয় আমি অনেক দুর হইতে আসিতেছি। আপনি যদি দয়া করিয়া আমাকে একটি মালা দেন তো বড় ভাল হয়। তিনি (দোকানদার) বলিলেন আজ হরতালের দিন কি করিয়া আপনাকে মালা দিই বলুন তো? আমি বলিলাম, আপনার কোন ভয়নাই। আপনি কোন বিপদে পড়িবেন না। তখন তিনি আমাকে একটি মালা দিলেন। আমি তাহার হাতে এ কটি আধুলি দিয়া দোকান হইতে

বাহির হইলাম। খানিকটা অগ্রসর হইবার পর সে ভদ্রলোকটী আমার কাছে অসিয়া একটি সিকি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, না আপনার মতন লোকের নিকট হইতে বেশী দাম লওয়া উচিত নয়। মনে মনে ভাবিলাম প্রভু এ তোমারি লীলা। তারপর ঠাকুর বাড়ীর কাছে আসিয়া দেখিলাম, জানালা ও দরজা বন্ধ। চিন্তা করিলাম যে আমি আসিয়াছি জানিলেই প্রভুর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিবে। সেই কারণে তখন ঠাকুর বাড়ীর বিপরীত দিকে গিয়া একটি বাড়ীর রকে বসিয়া দরজা খোলার অপেক্ষায় রইলাম। চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার গুরু ভগ্নী অর্থাৎ দীনেশদার স্ত্রী জানালা খুলিয়া আমায় ডাকিয়া বলিলেন, আপনাকে বাবা ডাকিতেছেন তৎক্ষনাৎ রক হইতে উঠিয়া প্রভুর কাছে যাইয়া তাঁহার শ্রীচরণের ধুলি লইলাম। আমাকে দেখিয়া প্রভু বলিলেন, "কি রে কামনা বেটি আমি তোদের বলিলাম, তোরা ভাবিস না, আমার বেটা মালা লইয়া আসিবে। তখন দীনেশবাবুর স্ত্রী ও অন্য গুরুভগিনীরা এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন শিবুদা খানিক আগে আমরা নিজেরা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করিতেছিলাম যে, আজ হরতালের দিনে বাবার মালা কোথায় পাওয়া যাইবে। তখন বাবা বলিলেন, তোদের ভাবিতে হইবেনা, আমার বেটা মালা লইয়া আসিবে আমরা তখন পুনরায় পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করিতে লাগিলাম যে অদ্য হরতালের দিনে শিবুদা ইন্টালী হইতে এতদূরে কি করিয়া আসিবে? তার ঠিক দশ মিনিটের

মধ্যে বাবা পুঃনরায় বলিলেন, "দরজা খুলে দেখ আমার বেটা এসে অপেক্ষা করিতেছে। অন্যদিন আমি প্রভুর কাছে বসিয়া তাঁহার গা, হাত ও পা টিপিয়া থাকি, ঐ দিন প্রভু তাঁহার কাছে বসাইয়া নিজেই আমার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। অতটা হাঁটা ও তৎসহ চিন্তার ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত তিন মিনিটের মধ্যে যেন উবিয়া গেল। জোর করিয়া বলিতে পারি, আধুনিক সভ্য জগতে অনেক রকম জড়বিজ্ঞান মেশিনারী ও বৈদ্যুতিক 'রে' ও বহু ঔষধ ইহার কাছে হার মানিতে বাধ্য হইবেই এমন কি সারা রাশিয়া, আমেরিকাও জার্মানি প্রভৃতি রাষ্ট্র জড় হইলেও ঐ দিনকার ঘটনায় প্রভুর কাছে হার স্বীকার করিতে বাধ্য হইত ও বলিতে দ্বিধা করিত না যে দর্শন শাস্ত্রের কাছে আধুনিক জড়বিজ্ঞান বহুগুনে স্থূল। তাঁহার নিকট কোন বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই তিনি তাহা বুঝাইয়া দিতেন। যদি কেহ প্রভুর নিকট গিয়া কোন লোক অন্যায় করিয়াছে জানাইত প্রভু তাহলে বলিতেন সেই লোকটিকে এখানে আসিতে দিসনি। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে উক্ত ব্যক্তি প্রভুর নিকট আসিলে তিনি বলিতেন, কিরে কেমন আছিস? ভাল আছিস তো? অনেক দিন আসিস নাই ইত্যাদি।

ঠাকুর বাড়ীর পুরোহিত বাবার কাছে মন্ত্র নিতে চাইলে তিনি বলিলেন, তুই কৃষ্ণজীর পূজা করিস, তোকে কৃষ্ণ মন্ত্র দিব কিন্তু মিথ্যা কথা বলিতে পারবি না। একথা উক্ত পুরোহিতকে কেন বলিলেন তখন বুঝিতে পারি নাই পরে জানিতে পারিয়া ছিলাম। একদিন

কিরণদা, রবিবাবু, বঙ্কিমবাবু ইত্যাদি প্রভুর কাছে আসিয়া বলিলেন বাবা ঐ পুরোহিত লোকটা সুবিধার নয় সদাই মিথ্যা কথা বলে। নিজে অন্যায় করিয়া পরের উপর দোষ চাপায় এত বড় আস্পর্দ্ধা যে সে আজ আপনার জিনিষ চুরি করিয়াছে। প্রভু তখন খুব রাগান্বিত হইয়া বলিলেন ও যেন আমার সামনে না আসে। তারা ঠিক দশ হইতে পনেরো মিনিটের মধ্যে উক্ত পুরোহিত প্রভুর কাছে আসিলে তিনি বলিলেন, "বেটা ভাল আছিস বোস" এসব মহাপুরুষদের লীলা আমাদের মতন সামান্য জীব কি বুঝিবে? এখন কিছুটা প্রভুর প্রেরনায় তাহা বুঝিতে পারি। যে যতই দোষ করুকনা কেন কেবল মাত্র তাহার সেই কর্ম অন্যায় হইয়াছে বলিতে পারি তাহার উপর রাগ করিবার কোন অধিকার নাই। তাহার উপর রাগ করিলে সেই রাগ প্রভুর উপর করা হয়।

প্রভু নিত্য দক্ষিণেশ্বর যাইতেন, তখন অবধি একদিনও তিনি কালীঘাটে যান নাই। অনেকে প্রায় বলিতেন বাবা একদিন কালীঘাটে চলুন। একদিন বিকালে বাবুঘাট হইতে ফিরিবার পর প্রভু নিজে হইতেই বলিলেন, আজ কালীঘাটে চল। যে যে যাইবে পনেরো মিনিটের ভিতর ঠিক হইয়া নে। তার ঠিক দশ মিনিট বাকি থাকিতে বলিলেন সকলে মিলিয়া বল, "নমামি শঙ্কর, নমামি শঙ্কর নমামি শঙ্কর"। ঐ পূজামন্ত্র কালীঘাটের মন্দিরে গিয়া থামিলে তার পর সকলে পূজার সন্দেশ ও ফুল কিনিতে গেল প্রভু ও আমি

মায়ের সামনে দাঁড়াইয়া রইলাম, সে সময় আমার বাহ্যজ্ঞান কয়েক মিনিটের জন্য ছিলনা বলিলেই হয়। দীনেশদা ইত্যাদি সকলে আসিলে পুরোহিত মন্ত্র বলাইয়া সকলকে পূজা করাইবার পর সকলে মায়ের পায়ে পুষ্প নিবেদন করিল, আর আমার হাতের ফুল গিয়া পড়িল মহাতীর্থে অর্থাৎ আমার পরমারাধ্য গুরুদেবের শ্রীচরণে। সেই দিন প্রভু দীনেশদা ইত্যাদির উপর রাগিয়া বলিলেন, আর কোন দিন আমাকে এরকম একলা ফেলিয়া যাসনি। তখন কিরণদা বলিলেন, বাবা আপনার কাছে তো শিবু ছিল। তখন বাবা বলিলেন অন্য যায়গার কথা আলাদা। কিন্তু কোন মন্দিরের ভিতর শিবু আমার কাছে থাকা আর না থাকা সমান।

প্রত্যহ বিকালে নাম কীর্ত্তন, ভজন ও ধর্ম সভা হইতে অনেক জ্ঞানী ও গুণী প্রভুকে নিত্য গান শুনাইবার জন্য নিজ থেকেই আসিতেন। এখানে অভয় ঠাকুরের পরিচয় দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। অভয় ঠাকুর সিদ্ধিমায়ের দীক্ষিত শিষ্য ও আনন্দময়ীমায়ের একজন প্রিয় ভক্ত। তিনি প্রায়ই তাহার স্বরচিত গীত ও পালা কীর্ত্তন ও ভজন প্রভুকে অত্যন্ত ভক্তির সহিত শুনাইতেন। অনেক বড় বড় নাম করা গায়কের গান ঐখানে হইয়াছে। তাহাদের কাছে অভয় ঠাকুর সাধারণ জ্ঞানের দিক হইতে হয়তো ছোট হইতে পারেন। কিন্তু ভক্তি ও দরদ দিয়া গান অভয় ঠাকুরের সমকক্ষ খুব কমই শোনা গিয়াছে। অর্থাৎ যাহাকে প্রকৃত জ্ঞাণী বলে যেন ভগবৎ প্রেমে মত্ত হইয়া সদাই মাতোয়ারা। আমি বেশ লক্ষ্য করিয়াছি

বাহিরে ভক্তদের ভিতরও এমনকি অনেক দীক্ষিত শিষ্যের চেয়ে অভয়ঠাকুর আসিলে প্রভু আনন্দিত হইতেন ও নিত্য তাহাকে নিজের গলা হইতে একটি করিয়া মালা দিতেন।

আমার পিতাঠাকুর এক শনিবার আমাকে বলিলেন ওরে কাল পরমহংস শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ বাবার শ্রীচরণ দর্শন করিবার বাসনা হইতেছে। আমি সেইদিন বিকালে প্রভুর কাছে গিয়া তাহার শ্রীচরণের ধুলি লইবার পর শীতলদাকে বলিলাম, বাবা কাল আসিতে চাহিতেছেন। কি করা যায় বলুন তো? আসিলে হয়ত প্রভু রাগ করিতে পারেন।

শীতলদা বলিলেন এক কাজ করুন, আপনার পিতাঠাকুরকে আনিয়া আমার কাছে দিয়া আপনি সরিয়া যাইবেন, বাবাকে না বলিলেই হবে। তারপরদিন শীতলদার কথানুযায়ী বাবাকে শীতলদার কাছে বসাইয়া আমি প্রভুর কাছে গিয়া তাঁহার চরণধুলি লইলাম। এবং ভিতরে রান্নার দিকে যাইবার ভান করিয়া ঐ ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। শীতলদা আমার পিতাঠাকুরকে লইয়া প্রভুর ঘরে ঢুকিলেন ও তাঁহার নিকটে লইয়া গেলেন। পিতাঠাকুর চোখে কম দেখিতেন। জোড় হস্তে প্রভুর দিকে যখন অগ্রসর হইতেছিলেন তখন তিনি শীতলদাকে বলিলেন, "বেটা বুড়া কোন হ্যায়? শিবুকা পিতাঠাকুর মালুম হোতা। শীতলদা বলিলেন হ্যাঁ বাবা। ঐ জন্যে বেটা আজ এখানে বসিল না। তিনি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, বেটা

কো বোলাও। বুড়ো মানুষকে কষ্ট দিয়ে এখানে আনিবার কি প্রয়োজন ছিল। আমায় বলিলে আমি নিজেই যাইতাম। তারপর আমার পিতাঠাকুরকে বলিলেন বুড়া তোমকো গীতা মিল গিয়া তব হিঁয়া কাঁহে আয়া, তোম কাঁহা মত যাও, কুঠিমে ধ্যান মে রও। আমি সামনে যাইলে রাগ একে বারে জল। হাসিতে হাসিতে বলিলেন বেটা বুড়ো মানুষকে কেন নিয়ে এলি। আমাকে বলিলে তো আমি নিজেই যাইতাম।

শিবরাত্র

শিবরাত্রিতে অনেকে শিব মন্দিরে ভক্তের সমাগম ও পূজা দেখিয়াছেন। কিন্তু যাহারা সেই বৎসর ১৯৬৩ সনে ৫৫ নং রাসবিহারী এভেন্যুস্থিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণদেব দয়াল আশ্রমে (গোবিন্দ মন্দিরে) ঢুকিয়া ডান পাশে যে ছোট ঘরটি আছে সেই ঘরের দৃশ্য দেখিয়াছেন তাহাদের কাছে শিব মন্দিরের দৃশ্য মনে হইবে যে কিছুই নয়।

সেইদিনকার দৃশ্য দেখিয়া যাহা মনে হইয়াছিল তাহা ভাষায় বর্ণনা করিতে না পারিলেও সরযু বাবার মুখ হইতে শোনা প্রভুজীর কথাগুলি মনে পড়িয়া যায়। যখন প্রভু বিশ্বনাথ বাবা প্রথম প্রভুজীর কাছে গিয়াছিলেন, সেই সময় প্রভুজী যাহা বলিয়াছিলেন সেই কথা

গুলি পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। প্রভুজী ভক্তদের উত্তর দিয়াছিলেন "এ হামারা আসলি বিশ্বনাথ, এই হচ্ছে প্রকৃত কাশীর বিশ্বনাথ।"

সাতটার মধ্যে ঐ ছোট ঘরটিতে ভিড় ঠেলিয়া কোন রকমে প্রভুর শ্রীচরণের কাছে পৌঁছিলাম। দেখি সকলেই নানারকম ফল ও মিষ্টি লইয়া প্রভুর পূজা করিতেছে বা পূজা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমি প্রভুর জন্য একটি বড় মালা, আকন্দ ফুলের তিনটি ছোট মালা কিছু ফুল বেলপাতা যৎসামান্য ফল ও সামান্য কিছু সন্দেশ, সিদ্ধি ও একবাটী চন্দন লইয়া গিয়াছিলাম। প্রথমে গঙ্গা জলে প্রভুর শ্রীচরণ ধুইয়া প্রভুর কপালে ও হাতে চন্দন লেপন করিয়া মস্তকে ঝুঁটির মতন বাঁধিয়া, একটা মালা, দুহাতে দুটি ও গলায় একটী মালা পরাইয়া মনের আনন্দে ওঁ নমঃ পার্বতী পতে হর হর মহাদেব শম্ভো ইত্যাদি মন্ত্রে প্রভুর শ্রীচরণে অর্ঘ্য নিবেদন করিলাম।

প্রভুর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া মনে মনে প্রভুর স্তুতি করিতে করিতে যে দৃশ্য অবলোকন করিলাম তাহা বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব না হইলেও আমার সাধ্যমত তাহা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করছি। অবশ্য এই দৃশ্য বর্ণনা মুখে বলিয়া বা পুস্তকে লিখিয়া কাহাকেও সম্পূর্ণ আনন্দ দেওয়া যায় না। ইহা মনেপ্রাণে অনুভব করিয়া আনন্দ পাইতে হয়। অনেক পাঠকেরা হয়তো দেব বা দেবীমূর্ত্তির ছবিতে জ্যোতি দেখিয়াছেন। ঠিক সেই রকম প্রথমেই দেখিলাম আমার প্রভুর কপাল হইতে একটি জ্যোতি বাহির হইয়া ক্রমশঃ সেই জ্যোতিটি

আবার তাহার শরীরের বিভিন্ন অংশ হইতে সরু সরু অগ্নিশিখার ন্যায় বাহির হইতে লাগিল এবং আমার মনে হইতে লাগিল যেন ইহা আমার দিকেই আসিতেছে। পরে দেখিলাম সেই অগ্নিশিখাগুলি চতুর্দিকে ছড়াইয়া সমস্ত গুরুভাই ও ভগ্নীদের দিকে যাইতেছে। তখন আমার শরীরের প্রতিটি শিরা যেন কাঁপিতেছে ও গায়ের লোমগুলি খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। পূজা করিবার পর পুষ্প পাত্রে যে ফুল ও বেলপাতা পড়িয়াছিল সেই-গুলি লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম ওঁ নমঃ শিবায়নমঃ ওঁ নমঃ শিবায়নমঃ ওঁ নমঃ শিবায়নমঃ বলিতে বলিতে হাতের বেলপাতা ও ফুলগুলি প্রভুর মাথায় দিলাম। তখন দেখি প্রভু মাঝে মাঝে শিহরিয়া উঠিতেছেন। এতক্ষণে আমার মুখের বাক্যও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র মনে মনে বলিতেছি, জয় বাবা বিশ্বনাথ জয় বাবা বিশ্বনাথ। তারপর দেখি প্রভু আর আমি সেখানে আর কেহ নাই। পরে আমিও নাই মনে হইতে লাগিল। প্রভু ছাড়া বিশ্বে বুঝি আর কিছু নাই বোধ হইতে লাগিল। হঠাৎ ভিতর হইতে যেন একটা ধাক্কায় পুনরায় দেখিলাম সব ঠিক আছে। কিন্তু প্রভু যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছেন। ঐ অবস্থায় মনে হয় অন্ততঃ পাঁচ সাত মিনিট থাকিবার পর থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছেন।

১লা চৈত্র

প্রভুর জন্মদিবস উপলক্ষে সে দিনের অনুষ্ঠান কিছু বাড়ান হইয়াছিল। সকালে প্রভুর পূজা, ভজন, গীতাপাঠ, রামায়ন পাঠ, হোম ও

আরত্রিক, মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরণ, এবং বৈকাল ৫টা হইতে রাত্রি ১১টা অবধি ধর্মসভা, ভজন কীর্ত্তন ও অভয় ঠাকুরে পালা কীর্ত্তন, হইয়াছিল। সেইদিন অভয় ঠাকুরের গান এত ভাল হইয়াছিল যে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এক কথায় বলিতে গেলে প্রতি ছন্দে, ভাব ও ভক্তি সুরের মাধ্যমে প্রকাশিত হইতেছিল।

তারপর প্রভুর কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তনের দিন স্থির হইল…চৈত্র…।

যাইবার পূর্বদিনে ভক্তবৃন্দের সমাবেশ অত্যন্ত বেশী রকমের হইয়াছিল। ঠিক ৯॥০টার সময় সভা ভঙ্গ হইবার পর সকলে প্রভুর পায়ের ধুলি লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তখন আমরা জোড় হস্তে প্রত্যেক ভক্তকে জানাইলাম যে তাহারা নিত্য যেমন প্রভুকে দূর হইতে প্রণাম করেন সেই রকম করুন, কারণ প্রভুর পায়ে হাত দিলে তিনি খুব খুসি হন না। সেই সময় একজন ৯০ হইতে ৯৫ বৎসরের বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমি আজ অনেক আশা করিয়া আসিয়াছি যে, অদ্য পরমহংস বিশ্বনাথ বাবার পায়ের ধুলা লইয়া পরিত্রাণ পাইব, এমন কি পাপ করিয়াছি যে তিনি আমাকে তাঁহার পা ছুঁইতে না দিয়া বিফল মনোরথ করিয়া তাড়াইতে চান। তখন প্রভু বলিলেন আজ সবকো ছোড় দে, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক, ভক্তের জয়, ভক্তই বড়, আর কাহাকেও থামানো গেল না। অনেকে তখন বাহির হইয়া গিয়াছিল, রাস্তা হইতে খবর পাইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিতে লাগিল। ৯॥টার পর হইতে

প্রভুর পায়ে ধুলি লইবার পালা যখন শেষ হইল দেখা গেল তখন ১১টা বাজিয়া গিয়াছে। তখন আমাদের মনে হইল তিনি যে ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু। তারপর প্রভুকে আসর হইতে ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। আমি অন্য দিনের ন্যায় প্রভুর পায়ের তলায় বসিলাম। অন্যদিন প্রভুর শ্রীচরণের ধুলি লইয়া বলিতাম বাবা আজ আসি, তিনি বলিতেন আয় বা কোনদিন বলিতেন আর একটু বোসে যা, সেদিন ঘরে গিয়া বসিয়া রহিলাম বলিতে পারিলাম না যে বাবা আসি। একে একে ক্রমশঃ ঘর প্রায় খালি হইয়া গেল। তখন হয়ত ১০-১৫ জন গুরুভাই ও বোনেরা আছি, প্রভু বলিলেন, শিবু তোর আজ অনেক রাত হয়ে গেল, বাস মিলেগা তো ? আচ্ছা দেখ মিলে যাবে।

তখন আমি তাঁহার শ্রীচরণ আমার মস্তকে, জিহ্বা ও বক্ষে ধারণ করিলাম, তারপর তিনি তাঁহার গলা হইতে একটি মালা খুলিয়া আমার গলায় পরাইয়া দিলেন পুনরায় আমি তাঁহার শ্রীচরণের ধুলি লইয়া জোড়হস্তে পিছনে হাঁটিতে হাঁটিতে প্রভুর ঘর হইতে বাহির হইলাম। তারপর রাধাগোবিন্দকে প্রণাম করিয়া শরৎ বোস রোডের (পুরাতন ল্যান্স ডাউন) মোড় অবধি হাঁটিয়া আসিলাম, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর একটি বাস আসিল কিন্তু কণ্ডাক্টার বলিল এ বাস কেবলমাত্র বাসের কর্মচারীদের জন্য। আমি বলিলাম আর বোধ হয় পাওয়া যাইবে না, সে বলিল কটা অবধি বাস চলে

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ পরমাত্মনী—
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রাম কমলোচনঃ॥"

আপনার বোধ হয় জানা নাই। তখন মনে মনে বলিতেছি "প্রভু বলিলেন যা মিলে যাবে" প্রভুর কথা অন্যথা হইতে পারে না, ঠিক সেই সময় বাসের ভিতর হইতে একজন দয়া বশতঃ বলিলেন, আপনি ভিতরে আসুন তারপর কণ্ডাক্টারকে বলিলেন, দেখ ভদ্রলোককে ভিতরে আসিতে দাও নাহলে ভদ্রলোক ভীষণ অসুবিধায় পড়িবেন তখন আমি উক্ত স্টাফকে ধন্যবাদ দিয়া বাসে উঠিলাম ও ইণ্টালী মার্কেটে নামিয়া বাড়ীতে গিয়া দেখিলাম ১২॥টা বাজিয়া গিয়াছে, হাতে মুখে জল দিয়া শুইয়া পড়িলাম। খাইবার কথা মনে হইল না। শুইলাম বটে কিন্তু চোখে ঘুম আসিল না খালি ভাবিতেছিলাম কাল হইতে কি করিব? কি করিয়া সময় কাটিবে? আর প্রভুর মধুর বানী "মেরা বেটা আগিয়া, শিবু এসেছে শিবু তুই এইখানে বোস, আমি যতক্ষণ ঠাকুর দালানে বসিব ততক্ষণ তুই আমার কাছ হইতে যাসনি এইসব শুনিতে পাইব না। দিন রাত্রি ঐ চিন্তাই হইল আমার কাল ঐ চিন্তাই পরে বাস্তবে পরিনত হইল। দিন পনের বাদে প্রভু দীনেশদাকে কাশী হইতে লিখিলেন যে আমি বাসন্তি পূজার দিন এখানে আশ্রমের ভিত পূজা করাইতেছি। তোরা সব কলিকাতায় কুমারী পূজা করবি। উক্তদিন প্রভু তাহার লেখা অনুযায়ী ভিত পুজা করাইয়া পুনরায় সকলকে খবর দিয়া ছিলেন। কলিকাতায় ও প্রভুর আদেশ-অনুযায়ী কুমারী পূজা করা হইয়াছিল।

জ্ঞান শক্তি সমারূঢ়স্তত্ত্বমালা বিভূষিতঃ।

ভুক্তি মুক্তি প্রদাতা চ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ইহার কয়েকদিন পরে প্রভু নিজের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিজের জীবনী সংক্ষিপ্ত করিয়া ১০ পৃষ্টায় লিখিয়া কিরণদার নামে রেজিষ্টারী করেন। এই খবরগুলি আমার কানে আসিবা মাত্র আমার বুকের ভিতর কে যেন একটা ধাক্কা মারিল। তারপর সদাই চিন্তা হইতে লাগিল প্রভুর শ্রীমুখের কথাগুলি, আশ্রমে থাকিতে চাইনা আমার প্রভুজী বজরায় দেহ রাখিয়াছেন আমিও যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন বজরায় কাটাইব তিনি কিরণদাকে বলিয়াছিলেন, যখন প্রয়োজন মনে করিব তখন আমার জীবন সম্বন্ধে তোকেই জানাইবো।

ইহার কয়েকদিন পরে, অফিস হইতে আসিয়া টেবিলের উপর একখানি পোষ্টকার্ড পাইয়া পড়িবামাত্র আমার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল, বারবার ভাল করিয়া পড়িলাম তবু যেন বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ শীতলদার বাড়ী ছুটিলাম। তাহার মুখেও ঐ কথা শুনিয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, ঐ ঘটনা সত্য কিনা? যতবার তাকে জিজ্ঞাসা করি তিনি একই কথা বলেন, তখন আমি বলিলাম শিতলদা তাহা হইলে আমরা এখন কোথায়? শিতলদা বলিলেন আমিও ত ভাবিতেছি তাই, কিবা করি কোথা যাই, পাইয়াও কুল, হারাইলাম ধরাতে।

তৎপরে আশ্রমে একখানি পত্র দিলাম পরে ঐ পত্রের উত্তর আসিলে জানিতে পারিলাম, যে (মুখ্যচন্দ্র চৈত্র গৌন বৈশাখ কৃষ্ণপক্ষ চতুর্থী ১৬ই বৈশাখ ১৩৬৩ সন (ইংরাজী ১৯৫৬) প্রভু

সকল সুমঙ্গল দায়ক, রঘুনায়ক গুনগান
সাদর সুনহিঁ তে তরহিঁ ভবসিন্ধু বিনা জলজান॥

হঠাৎ সজ্ঞানে ওঁ কার উচ্চারণ করিয়া ওঁ কারেলীন হইয়া যান। পরে যথা সময়ে কাশীতে ও কলিকাতায় ভাণ্ডারা দেওয়া হইয়াছিল।

প্রভু বিশ্বনাথ বাবা সদাই গ্রাম্যভাষার দ্বারা ভক্তদের বোঝাই-বার চেষ্ট করিতেন। অর্থাৎ এমন কথা ব্যবহার করিতেন যাহাতে সকলে অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারে। মাঝে মাঝে তুলসিদাশের দোঁহা ব্যবহার করিতেন !

আমি যে উপদেশ গুলি মনে রাখিতে পারিয়াছি ও প্রভূ নিজে হস্তে লিখিত পত্র হইতে কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিলাম।

১। জো পর কৃপা রাম কো হোঈ
তা পর কৃপা করৈ সব কোঈ ॥

২। ভগবান ভোলানাথের কৃপা ছাড়া রামের কৃপা লাভ হইতে পারে না।

বিনু তব কৃপা রাম পদ পঙ্কজ
সপনেহুঁ ভক্তি ন হোঈ ॥

৩। দেহু রাম রিপু রাম চরণ রতি
তুলসী দাস প্রভূ হরহু ভেদমতি ॥

৪। জাকী কৃপা সব লেয়তে মতি মন্দ তুলসা দসইঁপায়ো
পরম বিশ্রামধাম রাম সমান নহি আন কেউ।

অনেক জন্ম সংপ্রাপ্ত কর্ম্মবন্ধবিদাহিনে।—

আত্মজ্ঞান প্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ

৫। তুলসী হরে গুরু করুণা বিনু বিমল বিবেকন হোই।
কিনু বিবেক সংহার ঘোর নিধি পাব না পাবই
বেদই।...

৬। তুলসী দাসজী শ্রীগুরুর শ্রীচরণ কমল বন্দনায়
বলিয়াছেন।

বন্দৌ গুরু পদ কঞ্জ্ কৃপা সিন্ধু নর রূপ হরি
মহা মোহ তম পুঞ্জ্ জাসু বদন রবি করণী কর।
শ্রীগুরু পদ নখ সণি গণ জ্যোতি।
সুমিরত দিব্য দৃষ্টি হিয়ে হোতী
উভরহী বিমল বিলোচন হিয়েকে।
মিটহী দ্বেষ দুঃখ ভব রজনীকে
গুরু কৃপাহি কেবলম্।

৭। মিলহঁনা রঘুপতি বিনু অনুরাগ
কিয়ে জপ যোগ কঠীণ বিরাগ
(তুলসী দাস রামায়ন)

৮। নহীঁ কলি কর্ম্মণ ধর্ম্ম বিবেকু রাম নাম অবলম্বন একু
(তুলসী দাস রামায়ন)

৯। রাম-নাম-মণি-দীপ ধরু, জীহ দেহরী-দ্বার।
তুলসী ভিতর বাহেরহুঁ জৌ চাহসি উজিআর॥

শম, বিচার, সন্তোস ও সাধু সঙ্গ
এই চারিটি মুক্তি মন্দিরের দার পাল।

১০। ব্যাপকু একু ব্রহ্ম অবিনাশী।
সত চেতন ঘন আনন্দ রাশী॥
অস প্রভু হৃদয়ঁ অছত অবিকারী।
সকল জীব জগ দীন দুখারী।
নাম নিরূপণ নাম জতন তেঁ।
সোউ প্রগটত জিমি মোল রতন তেঁ॥

১১। সকল সুমঙ্গল দায়ক, রঘুনায়ক গুণগান।
সাদর সুনহিঁ তে তরহিঁ ভবসিন্ধু বিনা জলজান॥

প্রভু বিশ্বনাথ বাবার উপদেশ।

১। আগে নিজে সৎ হওয়া চাই তবে সৎগুরু মিলিবে। গুরু কৃপা ছাড়া বিশ্বমাঝে সার বস্তু কি থাকিতে পারে। গুরু কৃপাহি কেবলম্।

২। যখন ব্রহ্মকে পাইবার জন্য প্রাণ কাঁদিয়া ব্যাকুল হয়, তখন ভগবান স্বয়ং তাহার সহায় হইয়া সদগুরুরূপে উপস্থিত হন। সৎগুরু ব্রহ্ম।

৩। সৎগুরু লাভ হইলে জানিবে ঈশ্বরকে পাইলে কারণ সৎ-গুরু এবং ঈশ্বর দুই এক কোন প্রভেদ নাই।

৪। গুরু আজ্ঞা সর্ব্বত্র শিরোধার্য্য।

শোষণং ভবসিন্ধোশ্চ জ্ঞাপনং সারসম্পদঃ।—
গুরোঃ পাদোদকং সম্যক তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

৫। সৎ চিৎ আনন্দরূপ পরমাত্মা।

৬। পরমাত্মায় রূপ শান্তিময় সুধাময় নির্ব্বানপদ।

৭। পরমাত্মায় শরণ লইলে প্রভু অবশ্য শরণে লন যেন জীবের অবগুণকে ক্ষমা করেন।

৮। যে পর্য্যন্ত জীব প্রভুর শরণে যায় না সে পর্য্যন্ত বাস্তব জীবকো সুখ শান্তি প্রাপ্ত হয় না।

৯। প্রাণিগণের এই কর্ত্তব্য ভক্তির সহিত সৎ সঙ্গ করিবে। ভক্তির সহিত সৎ সঙ্গ করিলে কুবুদ্ধি সুবুদ্ধি হইয়া যায়। সৎবুদ্ধি হইতে সুখ ও শান্তি প্রাপ্তি হয়।

১০। নবদা ভক্তি কার়ঃ—

শ্রবণং, কীর্ত্তনং, বিষ্ণোস্মরণং, পাদসেবনম্

অর্চণং, বন্দণং, দাস্যং, সখ্যং, আত্ম-নিবেদনম্।

১১। ভক্তিতে ভগবানকো ডাকো ভক্তি করিলে হৃদয় নির্মল হইয়া আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আত্মজ্ঞান হইলে জীব ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়।

১২। ভগবানের নাম সর্বদা জপ কর :—

সুখে, দুঃখে, ভাবে কিম্বা কুভাবে যে যেভাবে ডাক সেই ভাবে ভগবান আছেন। ভগবান বাঞ্ছা কল্পতরু। ভক্তের মনঃবাসনা পূর্ণ করেন। ভক্তাধীন হরি ভক্তবৎসল ভগবান, যেই রাম, সেই কৃষ্ণ—

"এ মায়া প্রপঞ্চময়" ভবরঙ্গমঞ্চ মাঝে

রঙ্গময়ী মহামায়া যারে যা সজান সে তাই সাজে ॥

ভজ মিঠি করি নামের সহিত আছেন শ্রীহরি।
কলিযুগেতে সরল উপায় প্রভুর নাম স্মরণ।
হরে নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্
কলৌ নাস্তের, নাস্তেব, নাস্তৈব গতিরন্যথা।

১৩। যে ব্যক্তির সদ্ সদ্ বিবেক আছে সেই জাগরিত ব্যক্তিই ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে পারে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে মিত্র-বৎ পায় ও ভব বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে।

১৪। সমস্ত বিষয় যাহার বীতরাগ হইয়াছে, যিনি মোহশূন্য এবং যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন তিনি প্রকৃত সাধু।

বর্জ্জণীয়।

১। সদাই পরচর্চ্চা পরনিন্দা বর্জনীয়।

২। কখন কাহার হিংসা করিবে না।

৩। পরস্ত্রীতে কাতর হইবে না।

৪। অজ্ঞাত কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য না করাই শ্রেয়।

৫। কথা যত কম কহিবে তত ভাল।

৬। লোভ বা জাগতিক বাসনা সদাই ত্যাজ্য।

৭। সকল প্রকার বিষয় বিষবৎ ত্যাজ্য, কারণ বিষয় বৈরাগ্যই মুক্তি।

৮। যে কোন কামনা বাসনা ত্যাগ করিয়া উপাসনা করিবে।

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোধিকং তপঃ।—
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

৯। অযাচিত ভাবে কাহাকেও কোন প্রকার উপদেশ দিবেনা।

১০। কোন ধর্ম্মকে অশ্রদ্ধা-করিবে না। সকল ধর্ম্ম সমান জানিবে।

—ঃ মনুষ্যের প্রকৃত বল ঃ—

১। সত্যহি কেবলম্ বলম্।

২। ক্ষমতা অনুযায়ী পরোপকার করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

৩। রিপু সকলকে সদাই আপন বশে রাখিবে।

৪। সদা সৎসঙ্গ করিবে।

৫। সমাধিনিষ্ঠ ব্যক্তি সদাই সুখী।

৬। যে সকল বিষয় সন্তুষ্ট সেই প্রকৃত ধনী।

৭। ব্রহ্মবিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা।

৮। নিজের মনকে জয় করিতে পারিলে তবে বিশ্বজয় করিতে পারিবে।

৯। যে ললনার কটাক্ষে মোহিত হয় না তাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর বলা যাইতে পারে।

জয় গুরু

ভজ গুরু বিশ্বনাথ প্রভু হরিহর,
ব্রহ্ম নারায়ণ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

পরিশিষ্ট (ক)

হরিহর বিশ্বনাথ আশ্রম
ও
শ্রীশ্রীসরজুবাবা

এরপর বজরার অবস্থা কিরূপ হইল বলিতে গেলে বলিতে হয় অচল। তেমন আর ভক্ত সমাগম হয় না। শিষ্যদের ভিতর বেশীর ভাগ আর তেমন আগ্রহ নাই এতদবস্থায় কাশীর গুরুভাইয়েরা (অবশ্য কলিকাতা ও অপর সকল স্থানের মত লইয়া) ৯০ বৎসরের বৃদ্ধ শ্রীশ্রীসরজুবাবাকে নৌকায় লইয়া আসিলেন। শ্রীশ্রীসরজুবাবা প্রথমে আসিতে নারাজ হইলেও শেষ অবধি এই অজুহাতে আসিয়া ছিলেন, যে তিনি কেবল মাত্র সেবাইত হইয়া দেখাশুনা করিতে পারেন প্রভুজীর গদিতে বসিতে পারিবেন না।

এইখানে শ্রীশ্রীসরজুবাবার পূর্ব্ব পরিচয় কিছু জানাইতে বাধ্য হইলাম। কাশীর শহর হইতে কয়েক মাইল দূরে (লতা গ্রামের উত্তরে) বোহিনিয়া থানার অন্তর্ভুক্ত ছিতানি গ্রামে এক ভুঁইয়ার ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম সুমঙ্গল সিং। তাহার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল। অনেক জমিজমা, চল্লিস পঞ্চাশটি গাই ও চল্লিশ পঞ্চাশটি মহিষ ছিল। তিনি সত্যবাদী দীর্ঘ তেজস্বী পুরুষ ছিলেন।

ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবেসবার্থসাধিকে।—

শরন্যে অম্বকে গৌরি নারায়নী নমস্তেতে॥

তিনি কোন সাধুর কাছে যাইতেন না ও সকলকে বলিতেন, সত্য কথা বল, ভুলেও কাহারও অমঙ্গল কামনা করিও না তাহলে কোন সাধুর কাছে যাইতে হইবে না।

একদিন কোন কার্য্যবশতঃ তাহার কোন এক বন্ধুর সহিত তিনি কাশীতে আসেন। ফিরিবার পথে তিনি বন্ধুকে বলিলেন ভাইয়া শ্রীশ্রীহরিহর বাবার বয়স অনেক হইয়াছে কবে দেহ রাখেন তার কোন স্থিরতা নাই চল একবার দর্শন করিয়া যাই।

বন্ধুটি বলিলেন যে তুমিতো সকলকে সাধু মাহাত্মার কাছে যাইতে মানা কর। শ্রীশ্রীসরজুবাবা বলিলেন ইনি সাধারণ সাধু নন, তাঁহাকে দেখিলেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে। দুইজনে প্রভুজীকে দর্শন করিয়া তাহার শ্রীচরণের ধূলি লইয়া তাঁহার নিকট বসিলেন। সন্ধ্যা আগত কিন্তু সরজুবাবার উঠিবার কোন আগ্রহ নাই। তখন বন্ধুবর তাহাকে বলিলেন চল আর অধিক দেরী করিলে ফিরিতে অসুবিধা হইবে। সরজুবাবা বলিলেন আমি আর ফিরিবনা এমন পবিত্র জায়গা ত্যাগ করিয়া আমার মন যাইতে চাইতেছে না। বন্ধু বলিলেন সে কি তুমি গৃহস্থ, সংসারে স্ত্রি, কন্যা ও পিতৃহারা ভ্রাতুষ্পুত্রেরা রহিয়াছে, তুমি এখানে অবস্থান করিলে তাহাদের কি গতি হইবে। সরজুবাবা বলিলেন ভাল মন্দ বিচার করিবার প্রয়োজন দেখিতেছিনা মালিক যাহা করাইবেন তাহাই হইবে। শেষ অবধি বহু চেষ্টাতেও যখন সরজুবাবা ফিরিলেন না তখন বন্ধুবর একাকী

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথা মদগুরু শ্রীজগৎগুরু।—

মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ফিরিতে বাধ্য হইলেন। পরে সরজুবাবার স্ত্রী, কন্যা, ভাতুষ্পুত্রগণ ও ছোট ভাই প্রভুজীর কাছে আসিয়া সরজুবাবাকে গৃহে ফিরাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন।

বর্ষা আসিলে দেখা গেল যে নৌকার অবস্থা ক্রমশঃ অনুপযোগী হইয়া উঠিলে বিশেষতঃ একজন ৯০ বৎসরের বৃদ্ধের পক্ষে তো বটেই।

ইতিপূর্ব্বে দীনেশদার আপ্রাণ চেষ্টায় ও গুরুভ্রাতা ও ভগ্নীদের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া যেস্থানে প্রভু বিশ্বনাথ বাবা নিজে হাওড়ার কদমতলার নির্ম্মলেন্দু গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহিত একমত হইয়া অসি-ঘাটের নিকট আশ্রমের জন্য জমি ক্রয় করিয়া পরে নিজে ভীত পূজা করিয়া ছিলেন, সেইখানে আশ্রমের ঘর নির্ম্মাণ করাইয়া সরজু বাবাকে লইয়া আসিলেন।

এইস্থানে কতিপয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হইল যাঁহারা খুব বেশী আর্থিক সাহায্য করিতে অসমর্থ হইলেও কায়িক পরিশ্রম দ্বারা দীনেশবাবুর এ মহৎ কার্য্য সম্পাদনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছাড়া দীনেশবাবুর এ মহৎ কার্য্যে সফলকাম হওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য হইত। যথা শীতলদা, প্রফেসার অযোধ্যা সিং, শিউনায়ক মিশ্র, মঙ্গল দত্ত, পরেশবাবু, রবি-বাবু, কণ্ট্রাকটার কালীবাবু, শ্রীমতী লীলা নিয়োগী, শ্রীমতী সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী কামনা গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি। বিশেষতঃ কণ্ট্রাকটার কালীবাবু আমাদের গুরুভাই না হইলেও আশ্রমের কর্ম্ম-

---

সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তি ভূতে শনাতনি।—

গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্তুতে॥

কর্ত্তাদের সহিত সমভাবে কার্য্যে সাহায্য করার জন্য আমরা (গুরুভ্রাতা ও ভগ্নীগণ) তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

পরবৎসর আরাধনা তিথি উৎসবের কয়েকদিন পূর্ব্বে দীনেশদা ও শীতলদা আমাকে বলিলেন শিবু ভাই তুমি তো কাশীতে কখনও যাও নাই এ বৎসর তোমাকে যাইতেই হইবে। প্রথমে অমত করিলেও শেষ অবধি যাইতে বাধ্য হইলাম।

যে দিন কলিকাতা হইতে সকল গুরু ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ কাশী অভিমুখে যাইবেন তাহার দুই দিন পূর্ব্বে আমি যাত্রা করিলাম কারণ গয়ায় আমার বিশেষ কার্য্যের জন্য একদিন দেরী হইবে। গয়ার কার্য্য সারিয়া যথা সময় কাশী পৌঁছিলাম।

কাশী পৌঁছিয়া প্রভু ও প্রভুজীকে প্রণমানন্তর শ্রীশ্রীসরযু বাবার শ্রীচরণ ধুলি লইবার সৌভাগ্য হইল। তিনি আমাকে স্মিতমুখে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও এমন মধুর ভাবে কথা বলিতে লাগিলেন যেন আমার সঙ্গে তাঁহার বহু দিনের ও জন্মজন্মান্তরের পরিচয় আছে। ইহার পূর্ব্বে সরযু বাবার সম্বন্ধে বহু কথা গুরু ভাইদের মুখে শুনিয়াছিলাম।

দীনেশদা ও শীতলদা বলিয়াছিলেন যে সরযুবাবাকে চেনা বড়ই দুঃসাধ্য তিনি সকলকে ধরা দিতে চান না। তিনি একজন উচ্চদরের সাধক যিনি ঘনিষ্টভাবে তাঁহার সঙ্গ করিয়াছেন তিনি ছাড়া আর কেহ জানিতে ও বুঝিনে পারিবেন না। তিনি বহিরঙ্গে সকলের সহিত এমন

গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরু পরমদেবতা।—

গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন যাহাতে সকলে তাঁহার নিকট আসিতে ইচ্ছুক হইত না।

কিন্তু পরমারাধ্য গুরুদেবের কৃপায় সরযুবাবা প্রথম হইতেই আমাকে প্রিয় শিষ্য মনে করিয়া অন্তরের সহিত স্নেহ করিতে লাগিলেন। গুরু ভ্রাতা ও ভগ্নাগণ কখন আশ্রমের বাহিরে যাইবেন আমি তাহার প্রত্যাশায় থাকিতাম, তিনি যেন তাহাই চাইতেন এবং নিরালা হইলেই তিনি আমার সহিত বহু অন্তরের কথা কহিতেন যেন তাহার কত আপনার লোক পাইয়াছেন।

এই পুস্তকে প্রভু ও প্রভুজীর লীলা কাহিনী অধিকাংশই তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনিয়া আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

আশ্রমে পৌঁছিয়া প্রথম দিন গঙ্গা হইতে স্নান করিয়া আশ্রমে আসিয়া যখন আদ্র্র বস্ত্র শুকাইতে দিতে ছিলাম, সেই সময় আশ্রমের ভৃত্য, নাম ভকত আমাকে বলিল মহারাজ কাপড় বাঁধিয়া রাখুন নচেৎ বানরে কাপড় লইয়া যাইবে (এই স্থানে বলা বাহুল্য কাশীতে বানরের বড়ই উপদ্রব) তৎক্ষণাৎ সরযুবাবা ঘরের মধ্য হইতে বলিলেন শিবুকা কাপড়া বাদরে কখন লইবেনা। ইহার পর আমি দেখিয়াছি সরযুবাবার কথা অনুযায়ী আমার কাপড় বানরে কোন দিন স্পর্শ করে নাই।

একদিন প্রভাতে প্রভু ও প্রভুজীকে প্রণাম করিয়া সরযুবাবাকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখিলাম তিনি রামায়ন পাঠ করিতেছেন। আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম বাবা আপনি বিনা চশমায় পুস্তকাদি পড়িতে পারেন ? সরযুবাবা বলিলেন "একি আমার চোখে যে দেখিতে পাব না এ চোখটি হচ্ছে "প্রভুজীর চোখ।" আমি একথায় অবাক হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকায় তিনি বলিলেন সে আজ অনেক দিনের কথা তখন আমার বয়স ৬০—৬৫ হইবে পুস্তক পড়িতে বড়ই অসুবিধা হইতে লালিল ও ক্রমশ দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইতে ল্যাগিল। প্রভুজীর আদেশে আমি রামায়নআদি ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়ন করি কিন্তু দৃষ্টিহীন-তার দরুণ বুঝিবা এইবারে পড়া বন্ধ হয় এবং তাঁহার আদেশ পালনেও ব্যাঘাত হয় ঐরূপ ভাবিতেছি এমন সময় চক্ষে এত অধিক জল আসিল যে তাহা আর ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। প্রভূজী তথায় উপস্থিত না থাকিলেও তিনি অন্তর্য্যামী সমস্ত জ্ঞাত হইয়া আমাকে তাঁহার নিকট ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমি তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া দাঁড়াতেই তিনি বলিলেন তুই তোর নকল চক্ষু চাস না তোর আসল চক্ষু চাস। বোধ হয় তখন আমাকে দুষ্ট সরস্বতী ভর করিয়াছিল তাই বলিলাম আমার যদি দৃষ্টিহীনতা হয় তাহলে আমার বাঁচিয়া থাকি-বার প্রয়োজনই বা কি ? তবুও প্রভুজী বলিলেন তুই আসল চক্ষু চাস না পড়িবার চক্ষু চাস। আমি বলিলাম যতদিন বাঁচিব ততদিন পড়িতেই চাই, প্রভুজী বলিলেন যা বেটা তাই হবে তোর ইচ্ছা সফল হোক। সেই মুহূর্ত্তেই চক্ষুর দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল তদবধি আমার আর লিখিতে পড়িতে অসুবিধা হয় না।

সর্ব্বশ্রুতি শিরোরত্ন বিরাজিত পদাম্বুজ।

বেদান্তাম্বুজ পর্য্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরু ভ্রাতা ও ভগ্নীদের নিকট সরযুবাবার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

বাবা আপনি যখন শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণ কেদারনাথ দর্শনে গিয়াছিলেন তখন কি কাশী হইতে হাঁটিয়া গিয়াছিলেন ?

উত্তর—ভগবানের দেওয়া এই পা গাড়ী ছেড়ে আমি অন্য গাড়ী চড়িনা।

আপনার সঙ্গে কি কি ছিল ?

উত্তর—এক কপিন, এক কমণ্ডুল ও এক লাঠি।

গায়ে কোন বস্ত্র ছিল না ?

উত্তর—না তোরাই তো আশ্রমে এনে আমার বার্দ্ধক্য এনে দিলি। এখন মনে হয় শীতের সময় একখানা পাতলা চাদর গায়ে দিলে মন্দ হয় না। তখন কিন্তু কোন চটিতে দুইখানি কম্বল দিলে একখানি ফেরৎ দিয়া বলিতাম কেবলমাত্র পাতিয়া শুইবার জন্য একখানি কম্বল হইলেই চলিবে।

এখানে বলা বাহুল্য যে সরযুবাবা কোন বিভূতি মাখিতেন না।

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম বাবা এক চটিতে এক মাড়োয়ারীর সহিত আপনার কি ঘটনা ঘটিয়াছিল।

উত্তর—প্রথমে হাসিয়া উঠিলেন তাহার পর বলিলেন আমি যখন যে চটিতে থাকিতাম কখনও কাহাকে খাইবার কথা যাচিয়া

যদিক কমল দ্বন্দ্বং দুঃখতাপ নিবারকম্।—

তারকং বিপদাং বন্দে শ্রীগুরুং প্রণমাম্যহম্॥

বলিতাম না, কেহ কিছু অযাচিত ভাবে দিলে খাইতাম নচেৎ উপবাস থাকিতাম। একদিন এক চটিতে শুইয়া আছি জানিনা প্রভুজীর কি ইচ্ছা সেই দিন আমার অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইল ঠিক সেই সময় এক মাড়োয়ারীর দল প্রচুর খাদ্য আনিয়া আমার সামনেই খাইতে লাগিল। আমি বলিলাম সাধুকে ভোজন না করাইয়া তোমরা কি করিয়া ভোজন করিতেছ। তখন একজন বলিলন "সাধুকা খানা চটিসে মিলেগা" আর একজন বলিলেন "চটিকা অপিসমে যানেসেই মিলেগা।" আমি বলিলাম আমি কোথাও যাইতে চাইনা কেউ দিয়ে গেলে খাই। তখন তাহারা বলিল তবে চাইছেন কেন শুইয়া থাকুন আপনাকে খাওয়াইয়া যাইবেন এখন। আমি বলিলাম নিশ্চয় যখন প্রয়োজন হইবে মালিক পাঠাইয়া দিবেন। তারপর প্রভু-জীকে স্মরণ করিয়া শুইয়া রহিলাম ও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম কখন কাহারও কাছে কিছু চাইনা অথচ প্রয়োজন মত প্রভুজীর কৃপায় সব জুটিয়া যায়। আর অদ্য চাহিয়া তাহার প্রতিদান মিলিল কিছু গালি গালাজ। ঠিক সেই সময় চাহিয়া দেখি একটি মাড়োয়ারী ভদ্রলোক উক্ত মাড়োয়ারীর দলকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে এখানে একটি অভুক্ত সাধু এসেছে সে কোথায়? মাড়োয়ারীর

দুর্ল্লভং ত্রিষুলোকেষু তৎশৃনুধ্ব বদাম্যহম্।—
কিঞ্চিদ্ গুরুং বিনা নান্যৎ সত্যং সত্যং বরাননে॥

দলটি তাহার কথায় কর্ণপাত করিলনা তখন সেই মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি নিজে আমার কাছে এসে প্রণাম করিয়া এক চাঙ্গারী খাবার আমার সামানে রাখিয়া বলিলেন "সাধুবাবা আপ ভূখা হ্যায় আপকো আস্তে কুছ খানা লায়া কৃপা করকে লিজিয়ে" আশ্চর্য্যের বিষয় পূর্ব্বোক্ত মাড়োয়ারীর দল যে যে খাবার ভক্ষণ করিতেছিল সেই সেই খাদ্য দ্রব্যই ঐ চাঙ্গারীতে ছিল। ইহার পর অপর চটিতে যখন উক্ত মাড়োয়ারী দলের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল তখন তাহারা আমাকে খুসি করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল॥ কাশীতে যে কয় দিন সরযুবাবার সহিত ছিলাম সে কয়দিন যে কি আনন্দে ছিলাম তাহা আমার মত মূর্খের পক্ষে ভাষায় ব্যক্ত করা সুকঠিন। বিশেষতঃ সরযুবাবা যখন প্রভুজী ও প্রভু বিশ্বনাথ বাবার সম্বন্ধে সমস্ত অলৌকিক ঘটনাবলী বলিতেন তখন যুগপৎ আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইতাম। সেই সমস্ত বিশেষ বিশেষ লীলা কাহিনী এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিলাম না। পাঠক হয়ত বলিবেন কেন লিখিলেন না তাহার উত্তর এই যে সমজের চাহিদা আনুযায়ী চলাই শ্রেয়। যাহারা কখনও প্রকৃত সাধু দর্শন করেন নাই তাঁহাদের হয়ত এই সমস্ত ঘটনাবলী শুনিয়া মনে অবিশ্বাস আসিতে পারে এবং

তদহং স্বপ্নকাশেন গুরুশব্দেন কথ্যতে।—

দেহী ব্রহ্মভবেদ যস্মাদ তৎকৃপার্থং বদাম্যহম্॥

তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতির সম্ভাবনা হইতে পারে। বিশেষতঃ আমার পরমারাধ্য গুরুদেব প্রভু বিশ্বনাথ বাবা নিজে বলিয়া ছিলেন দেখ সৎগুরুই ঈশ্বর। গুরু বা কোন মাহাত্মার আলৌকিক ঘটনাবলী সগোত্র ছাড়া কোন ব্যক্তির নিকট বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত নয় (এখানে সগোত্র মানে ঈশ্বরের পথের পথিককে বলা হইয়াছে)।

একদিন বহির্ব্বাস ও কৌপীনের জন্য কাপড় কিনিয়া গিরিমাটিতে ছোপাইয়া সরযুবাবাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার হাতে ঐগুলি দিলাম তিনি উক্ত জিনিষগুলি অত্যন্ত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া পরিলেন। বিকাল বেলায় আমাকে ডাকিয়া বলিলেন শিব দেখ আমার কোন জিনিষ তোর কাছে থাকা উচিত কিন্তু আমার তো নিজের কিছুই নাই। তোর দেওয়া নূতন কৌপীনটি পরিয়া আবার তোকেই দিলাম। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রনাম করিয়া কৌপীনটি লইলাম।

কলিকাতায় ফিরিবার দিনে সবেমাত্র পূজা পাঠ করিয়া প্রভুজী ও প্রভূ বিশ্বনাথ বাবাকে প্রণাম করিয়া সরযুবাবার ঘরে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি এমন সময় দীনেশ দা বলিলেন শিবু ভাই আজ সকলেই যে যার প্রয়োজন অনুযায়ী জিনিস কিনিতে বিশ্বনাথের গলিতে যাইতে চায়। তুমি যদি না যাও তাহলে তোমাকে আশ্রমের সমস্ত বন্দোবস্ত করিবার জন্য থাকিতে হইবে। আমি বলিলাম

গুরুপাদোদকং সম্যক সংসারার্ণ বতারনম্।—

অজ্ঞান মূলহরনং জন্মকর্ম্ম নিবারনম্॥

আপনারা যান আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করিব। তখন দীনেশ দার স্ত্রী বলিলেন শিবুদা তাহলে আপনাকে একটি কার্য্যের ভার লইতে হইবে যথা আপনি অসির বাজার হইতে কিছু ফল ও মিষ্টান্ন লইয়া আসিবেন ও অভয়ঠাকুরের পূজা হইলে তাঁহাকে খাইতে দিবেন।

আমি অসির মোড় হইতে উক্ত জিনিষগুলি লইলাম, ও কিছু আঙ্গুর লইয়া আসিলাম তৎপর অভয়ঠাকুরের খাবার ও ফলগুলি তাঁহাকে দিয়া, একটি জলপাত্রে আঙ্গুরগুলি রাখিয়া ও অপর একটি পাত্র লইয়া সরযুবাবার কাছে গিয়া বলিলাম বাবা বাজারে ভাল আঙ্গুর পাইলাম আপনার জন্য লইয়া আসিয়াছি, এখন দিব। সরযু-বাবা বলিলেন তুই এনেছিস দে। আমি তখন আঙ্গুরগুলি জল হইতে তুলিয়া একটি একটি করিয়া কাটি বাছিয়া অপর পাত্রে দিতে ছিলাম আর তিনি খাইতে ছিলেন। সেই সময় দেখি তাঁহার চক্ষু হইতে জল বাহির হইতেছে। বলিলাম, বাবা কাঁদিতেছেন? তখন তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে যখন তুই কাহাকেও কিছু খাওয়াস তখন তাহাকে ভক্তিপূর্ব্বক যত্ন করিয়া খাওয়াস। আর দুটি ব্যক্তির কথা স্মরণ হওয়ায় আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে একজন তোর গুরুদেব বিশ্বনাথ বাবা ও অপর জন আমার গর্ভধারিণী মাতা। পুনরায় বলিলেন শিবু তুই তোর গুরুদেবের পূর্ণ আশীর্ব্বাদ পেয়েছিস।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম বাবা আপনি কাহাকেও দীক্ষা দেন না

জ্ঞান-বৈরাগ্য-সিদ্ধ্যর্থং গুরু-পাদোদকং পিবেৎ।—

গুরুবুদ্ধেস্তেন্নো নান্যৎ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥

কেন ? তিনি বলিলেন আমি কি গদিতে বসিয়াছি যে দীক্ষা দিব। আমি বলিলাম কেন বসেন নাই। তিনি তখন লাফ দিয়া উঠিয়া বলিলেন প্রভুজীর গদিতে বসে কাশীতে এমন কেহ নাই। আমি বলিলাম কেন প্রভু বিশ্বনাথ বাবা তো বসিয়াছিলেন তাহার উত্তরে সরযুবাবা বলিলেন আরে বিশ্বনাথ বাবার কথা ছেড়ে দে উনি শিবের অবতার। প্রভুজী তাঁহার পূর্ণ শক্তি তাঁহার ভিতর সঞ্চারিত করিয়া দিয়া তাঁহাকে নিজে গদিতে বসাইয়া দিয়াছিলেন। তারপর বলিলেন শিব তোকে আর আমি কি আশার্ব্বাদ করিব তুই তোর গুরুর কাছ হইতে যাহা পাইয়াছিস তোর গুরুর কৃপায় তাহাই যেন তোর মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠে।

তারপর ভোজন পর্ব্ব সারিয়া যে যার মালপত্র বিছানা ট্রাঙ্ক ইত্যাদি তুলিতে ব্যস্ত। আমার মালপত্র বিশেষ কিছুই ছিল না। আমি অতঃপর সরযুবাবার কাছে গিয়া তাঁহার চরণধুলি লইয়া বসিলাম সেই সময় আমি নিজে তাঁহাকে কিছু না বলিলেও তিনি আপনা আপনি আমাকে কতকগুলি মূল্যবান উপদেশ দেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় আমার নিত্য কর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি ভুল ছিল সেগুলি তিনি নিজে বলিলেন ও শুধরাইয়া দিলেন তারপর সকলে কাশী হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সরযুবাবাকে প্রণাম করিতে আসিলে আমি তখন তাঁহাকে প্রনাম করিয়া উঠিয়া দেখি যে তাঁহার চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতেছে।

তার কিছু দিন পরে পরেশ বাবুর পত্রে জানলাম যে সরজুবাবা সজ্ঞানে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

ওঁ তৎ সৎ

মহাবীরের স্মরণে

গীত

মহাবীর কৃপাকর তোমার পায়ে পড়ি,
সর্পের লাগি চলা মনে বল কেমনে চলি ॥
মন আমার শুনেও শুনেনা তাইতো তোমায় বলি,
তোমার কৃপা পেলে পরে ঠিক পথেতে চলি ॥
পুরানে, শুনেছি প্রভু ভব পারের তরী,
পার করিতে পারি যদি তোমার মতে চলি ॥
তাই তো তোমার নাম হে প্রভু শঙ্কট মোচন কারী
কৃপা করে বল প্রভু কোন পথেতে চলি ॥

ওঁ

অথ হনুমান চালীসা

দোহাঃ—

শ্রীগুরু চরণ সরোজ রজ, নিজমন মুকুর সুধার ॥
বরণোঁ রঘুবর বিমল যশ জো দায়ক ফল চার ॥
বুদ্ধিহীন তনুজানিকৈ সুমিরৌঁ পবনকুমার ॥
বল বুধি, বিদ্যা দেহু মোহি হরহু কলেশ বিকার ॥

চৌপাঈ

জয় হনুমান জ্ঞান গুন সাগর, জয়কপিশ তিহুঁ লোক উজাগর
রামদূত অতুলিত বল ধামা, অঞ্জনি পুত্র পবনসুত নামা ।

মহাবীর বিক্রম বজরঙ্গী, কুমতি নিবার সুমতিকে সঙ্গী।
কঞ্চন বরণ বিরাজ সুবেশা, কানন কুণ্ডল কুঞ্চিত কেশা।
হাথ বজ্র অরু ধ্বজা বিরাজে, কাঁধে মুঞ্জ্ জনেউ সাজৈ।
শঙ্কর সুবন কেশরী নন্দন, তেজ প্রতাপ মহা জগবন্দন।
বিদ্যাবান গুণী অতি চাতুর, রাম কাজ করিবেকো আতুর।
প্রভু চরিত্র শুনিবে কো রসিয়া, রাম ও লখন সীতা মন বসিয়া।
সূক্ষ্মরূপধরি সিয়হি দিখাবা, বিকট রূপ ধরি লঙ্কা জরাবা।
ভীম রূপ ধরি অসুর সংহারে, রাম চন্দ্র-কে কাজ সঁবারে।
লায় সঁজীবন লখন জিয়ায়ে, শ্রীরঘুবীর হরষি উরলায়ে।
রঘুপতি কিনহী বহুত বড়াই, তুমপ্রিয় ভরতসরিস মমভাই।
সহস বদন তুম্হরো যশ গায়ো, অস কহি শ্রীপতি কণ্ঠ লগায়ো।
সনকাদিক ব্রহ্মাদি মুনীশা, নারদশারদ সহিত অহীশা।
যম কুবের দিগপাল জহাঁতে, কবি কোবিদ কহি সকেঁ কহাঁতে।
তুম উপকার সুগ্রীবহি কীন্হা, রাম মিলায় রাজপদ দীন্হা।
তুমহরো মন্ত্র বিভীষণ মানা, লঙ্কেশ্বর ভয়ে সব জগ জানা।
যুগ সহস্র যো জন জো ভানু, লীল্যো তাহি মধুর ফল জানূ।
প্রভু মুদ্রিকা মেলি মুখ মাহীঁ, জলধি লাঁধি গয়ে অচরজ নাহীঁ।
দুর্গম কাজ জগতকে জেতে, সুগম অনুগ্রহ তুমহারে তেতে।
রাম দুয়ারে তুম রখবারে, হোতন আজ্ঞা বিনু পৈসারে।
সব সুখ লহেঁ তুমহারী শরনা, তুম রক্ষক কাহু কো ডরনা।
অপনা তেজ সম্হারো আপৈ, তিন লোক হাঁকতে কাঁপৈ।
ভূত পিশাচ নিকট নাহিঁ আবৈ, মহাবীর জব নাম সুনাবৈ।

নাসৈ রোগ হরৈ সব পীরা, জপত নিরন্তর হনু মত বীরা।
সঙ্কট সে হনুমান ছুড়াবৈ, মন ক্রম বচন ধ্যান জো লাবৈ।
সবপর রাম রায় সিরতাজা, তিনকে কাজ সকল তুম সাজা।
ঔর মনোরথ যো কৈ লাবৈ, তাসু অমিত জীবন ফল পাবৈ।
চারো যুগ পরতাপ তুমহারা, হৈ পরসিদ্ধ জগত উজিয়ারা।
সাধুসন্তকে তুম রখবারে, অসুর নিকন্টন রাম তুলারে।
অষ্ট সিদ্ধি নবনিধিকে দাতা, অস বর দীন জানকী মাতা।
রাম রসায়ন তুমহারে পাসা, সাদর তুম রঘুপতিকে দাসা।
তুম্হরে ভজন রামকে পাবৈ, জন্ম জন্মকো তুখ বিসরাবৈ।
অন্তকাল রঘুপতি পুর জাই, যাহা জন্ম হরিভক্ত কহাই।
ঔর দেবতা চিত্ত ন ধরই, হনুমত সেই সর্ব সুখ করই।
সঙ্কট হরৈ মিটৈ সব পীরা, জো সুমিরত হনুমত বল বীরা।
জয় জয় জয় হনুমান গুসাঁঈ, কৃপা করো গুরু দেব কী নাঁঈ।
যহ শতবার পাঠ কর জোঈ, ছুটৈ বন্দি মহাসুখ হোঈ।
জো ইহ পঢ়ে হনু মান চালীসা, হোই সিদ্ধি সাখী গোরীসা।
তুলসীদাস সদা হরি চেরা, কি জৈ দাস হৃদয়ে মহঁ ডেরা।

দোহাঃ—

পবন তনয় সঙ্কট হরণ মঙ্গল মূরতি রূপ।
রাম ও লখন সীতা সহিত হৃদয়ে বসহু সুর ভূপ।

ইতি হনুমান চালীসা সম্পূর্ণ।

ওঁ

সংকটমোচন—হনুমানাষ্টক

মত্তগয়ন্দ ছন্দ

বাল সময় রবি ভক্ষলিয়ো তব তীনহুঁলোক ভয়ো অঁধিয়ারো।
তাহিসোঁ ত্রাস ভঙ্গ জগকো যহ সংকট কাহু সো জাত ন টারো।
দেবন আনি করি বিনতী তব ছাড়ি দিয়ো রবি কষ্ট নিবারো।
কো নহি জানত হৈ জগমে কপি সংকটমোচন নাম তিহারো।
বালি কী ত্রাস কপীস বসৈ গিরিজাত মহাপ্রভু পন্থ নিহারো।
চৌঁকি মহামুনি শাঁপ দিয়ো তব চাহিয়ে কোন বিচার বিচারো।
কৈ দ্বিজ রূপ লিয়ায় মহাপ্রভু সোঁ তুম দাসকো শোক নিবারো।
অঙ্গদকে সংগলন গয়ে সিয় খোজ কপীয়ে বৈন উচারো।
জীবত না বচিহো হাম সো জু বিনা সুধি লীনহেঁ ইহাঁ পগু ধারো।
হেরি থকে তট সিন্ধু সরবৈ তব লৈ সিয়কী সুধিপ্রাণ উবারো।
রাবণ ত্রাস দঈ সিয়কো রাক্ষস সোঁ কহি শোক নিবারো।
তাহি সময় হনুমান মহাপ্রভু জায় মহারজনীচর মারো।
চাহত সীয় অশোক সোঁ আগিসো দৈ প্রভু মুদ্রিকা শোক নিবারো।
বাণ লগ্যো উর লক্ষ্মনকে তব প্রাণ তজ্যো সুত রাবণ মারো।
লৈ গৃহ বৈদ্য সুষেণ সমেত তবৈ গিরি দ্রোণ সুবের উপারো।
আনি সঞ্জীবন হাথ দঈ তব লক্ষ্মনকে তুম প্রাণ উবারো।
রাবণ যুদ্ধ অজান কিয়ো তব নাগ কি পাশ সবৈ শির ডারো।
শ্রীরঘুনাথ সমেত সবৈ দল মোহ ভয়ো অতি শংকট ভারো।
আনি খগেশ তবৈ হনুমান জু বন্ধন কাটিসুত্রাস নিবারো।

বন্ধু সমেত জবৈ অহিরাবণ লৈ রঘুনাথ পতাল সিধারো।
দেবিহি পূজি ভলী বিধিসোঁ বলি দেহু সবৈ মিলি মন্ত্র বিচারো।
জায় সহায় ভয়ে তবহী অহিরাবণ সৈন্য সমেত সংহারো।
কাজ কিয়ো বড় দেবনকে তুম বীর মহাপ্রভু দেখি বিচারো।
কৌন সো সঙ্কট মোর গরীবকো জো তুম সোঁ নহি জাত হৈ টারো।
বেগি হরো হনুমান মহাপ্রভু জো কুছ সংকট হোয় হমারো।

দোহা :—

লাল দেহ লালী লসে অরু ধরি লাল লংগুর।
বজ্রদেহ দানব দলন জয় জয় জয় কপিশূর।
যহ অস্টক হনুমান কো বিরচিত তুলসীদাস।
গঙ্গা দাস জু প্রেমসোঁ পঢ়ে হোয় দুখনাশ।
—ঃ ইতি সংকটমোচন হনুমানাষ্টক সম্পূর্ণ ঃ—

শ্রীরামনামসঙ্কীর্ত্তনম্

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥"

শ্রীরামনামসঙ্কীর্ত্তনম্

ওঁ শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ

স্তবঃ

ইমন কল্যান

বর্ণানামর্থসঙ্ঘানাং রসানাং ছন্দসামপি।
মঙ্গলানাঞ্চ কর্ত্তারৌ বন্দে বাণীবিনায়কৌ ॥১॥
ভবানীশঙ্করৌ বন্দে শ্রদ্ধাবিশ্বাসরূপিণৌ।
যাভ্যাং বিনা ন পশ্যন্তি সিদ্ধাঃ স্বান্তঃস্থমীশ্বরম্ ॥২॥
বন্দে বোধময়ং নিত্যং গুরুং শঙ্কররূপিণম্।
যমাশ্রিতো হি বক্রোঽপি চন্দ্রঃ সর্ব্বত্র বন্দ্যতে ॥৩॥
সীতারামগুনগ্রামপুণ্যারণ্যবিহারিণৌ।
বন্দে বিশুদ্ধবিজ্ঞানৌ কবীশ্বরকপীশ্বরৌ ॥৪॥
উদ্ভবস্থিতিসংহারকারিণীং ক্লেশহারিণীম্।
সর্ব্বশ্রেয়স্করীং সীতাং নতঽহং রামবল্লভাম্ ॥৫॥
যন্মায়া বশবর্ত্তি বিশ্বমখিলং
ব্রহ্মাদিদেবাসুরাঃ
যৎসত্ত্বাদমৃষৈব ভাতি সকলং
রজ্জৌ যথাহের্ভ্রমঃ।
যৎপাদঃ প্লব এক এব হি
ভবাম্ভোধেস্তিতীর্ষাবতাম্,
বন্দেঽহং তমশেষ কারণপরং
রামাখ্যমীশং হরিম্ ॥৬॥

প্রসন্নতাং যা ন গতাভিষেকত-
স্তথা ন মম্লৌ বনবাসদুঃখতঃ
মুখাম্বুজ শ্রীরঘুনন্দনস্য মে
সদাস্তু সা মঞ্জুলমঙ্গলপ্রদা ॥৭॥
নীলাম্বুজশ্যামলকোমলাঙ্গং,
সীতাসমারোপিতবামভাগম্ ।
পাণৌ মহাশায়কচারুচাপং
নমামি রামং রঘুবংশনাথম্ ॥৮॥
মূলং ধর্ম্মতরোর্বিবেকজলধেঃ পূর্ণেন্দুমানন্দদম,
বৈরাগ্যাম্বুজ ভাস্করং হ্যঘঘনধ্বান্তাপহং তাপহম্,
মোহাম্ভোধরপুঞ্জপাটনবিধৌ খেসম্ভবং শঙ্করম্,
বন্দে ব্রহ্মকুলে কলঙ্কশমনং শ্রীরামভূপপ্রিয়ম্ ॥৯॥
সান্দ্রানন্দপয়োদসৌভগতনুং পীতাম্বরং সুন্দরম্,
পাণৌ বাণশরাসনং কটিলসৎতূণীরভারং বরম্ ।
রাজীবায়তলোচনং ধৃতজটাজূটেন সংশোভিতম্,
সীতালক্ষ্মণসংযুতং পথিগতং রামাভিরামং ভজে ॥১০॥
কুন্দেন্দীবরসুন্দরাবতিবলৌ বিজ্ঞানধামাবুভৌ,
শোভাঢ্যৌ বরধন্বিনৌ শ্রুতিনুতৌ গোবিপ্রবৃন্দপ্রিয়ৌ
মায়ামানুষরূপিণৌ রঘুবরৌ সদ্ধর্ম্মবর্ম্মহিতৌ,
সীতান্বেষণতৎপরৌ পথিগতৌ ভক্তিপ্রদৌ তৌ হি নঃ ॥১১॥
ব্রহ্মাম্ভোধিসমুদ্ভবং কলিমলপ্রধ্বসনং চাব্যয়ম্,
শ্রীমচ্ছম্ভুমুখেন্দুসুন্দরবরে সংশোভিতং সর্ব্বদা ।

সংসারাময়ভেষজং সুমধুরং শ্রীজানকীজীবনম্,
ধন্যাস্তে কৃতিনঃ পিবন্তি সততং শ্রীরামনামামৃতম্ ॥১২॥
শান্তং শাশ্বতমপ্রমেয়মনঘং নির্ব্বাণশান্তি-প্রদম্,
ব্রহ্মাশম্ভুফণীন্দ্রসেব্যমনিশং বেদান্তবেদ্যং বিভুম্।
রামাখ্যং জগদীশ্বরং সুরগুরুং মায়ামনুষ্যং হরিম্,
বন্দেহহং করুণাকরং রঘুবরং ভূপালচূড়ামণিম্ ॥১৩॥
কোকিকণ্ঠাভনীলং উরোবরবিলসদ্বিপ্রপাদাব্জচিহ্নম্,
শোভাঢ্যং পীতবস্ত্রং সরসিজনয়নং সর্ব্বদা সুপ্রসন্নম্।
পাণৌ নারাচচাপং কপিনিকরযুতং বন্ধুনা সেব্যমানম্,
নৌমীড্যং জানকীশং রঘুবরমনিশং পুষ্পকারূঢ়রামম্ ॥১৪॥
আর্ত্তানামার্ত্তিহন্তারং ভীতানাং ভয়নাশনম্।
দ্বিষতাং কালদণ্ডং তং রামচন্দ্রং নমাম্যহম্ ॥১৫॥
শ্রীরাঘবং দশরথাত্মজমপ্রমেয়ং সীতাপতিং রঘুকুলান্বয়রত্নদীপম্।
আজানুবাহুমরবিন্দদলায়তাক্ষং, রামং নিশাচরবিনাশকরং নমামি ॥১৬॥
বৈদেহীসহিতং সুরদ্রুমতলে হৈমে মহামণ্ডপে,
মধ্যে পুষ্পক আসনে মণিময়ে বীরাসনে সংস্থিতম্।
অগ্রে বাচয়তি প্রভঞ্জনসুতে তত্ত্বং মুনীন্দ্রৈঃ পরম্,
ব্যাখ্যাতং ভরতাদিভিঃ পরিবৃত্তং রামং ভজে শ্যামলম্ ॥১৭॥

প্রার্থনা

ইমন কল্যান

নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েমদীয়ে
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ ॥

শ্রীনামরামায়ণম্

সঙ্কীর্ত্তনম্

ওঁ শ্রীসীতালক্ষ্মণভরতশত্রুঘ্নহনুমৎ-
সমেতশ্রীরামচন্দ্রপরব্রহ্মণে নমঃ।

বালকাণ্ডঃ

তিলককামোদ—ত্রিতাল

১। শুদ্ধব্রহ্মপরাৎপর রাম ২। কালাত্মকপরমেশ্বর রাম
৩। শেষতল্পসুখনিদ্রিত রাম ৪। ব্রহ্মাদ্যমরপ্রার্থিত রাম
৫। চণ্ডকিরণকুলমণ্ডন রাম ৬। শ্রীমদ্দশরথনন্দন রাম
৭। কৌশল্যাসুখবর্দ্ধন রাম ৮। বিশ্বামিত্রপ্রিয়ধন রাম
৯। ঘোরতাটকাঘাতক রাম ১০। মারীচাদিনিপাতক রাম
১১। কৌশিকমখসংরক্ষক রাম ১২। শ্রীমদহল্যোদ্ধারক রাম
১৩। গৌতমমুনিসংপূজিত রাম ১৪। সুরমুনিবরগণসংস্তুত রাম
১৫। নাবিকধাবিতমৃদুপদ রাম ১৬। মিথিলাপুরজনমোহক রাম
১৭। বিদেহমানসরঞ্জক রাম ১৮। ত্র্যম্বককার্ম্মুকভঞ্জক রাম
১৯। সীতার্পিতবরমালিক রাম ২০। কৃতবৈবাহিদকৌতুক রাম
২১। ভার্গবদর্পবিনাশক রাম ২২। শ্রীমদযোধ্যাপালক রাম

অযোধ্যাকাণ্ডঃ

২৩। অগণিতগুণগণভূষিত রাম ২৪। অবনীতনয়াকামিত রাম
২৫। রাকাচন্দ্রসমানন রাম ২৬। পিতৃবাক্যশ্রিতকানন রাম

২৭। প্রিয়গুহবিনিবেদিতপদ রাম
২৮। তৎক্ষালিতনিজমৃদুপদ রাম
২৯। ভরদ্বাজমুখানন্দক রাম
৩০। চিত্রকূটাদ্রিনিকেতন রাম
৩১। দশরথসন্ততচিন্তিত রাম
৩২। কৈকেয়ীতনয়ার্থিত রাম
৩৩। বিরচিতনিজপিতৃকর্ম্মক রাম
৩৪। ভারতার্পিতনিজপাদুক রাম

অরণ্যকাণ্ডঃ

৩৫। দণ্ডকবনজনপাবন রাম
৩৬। দুষ্টবিরাধবিনাশন রাম
৩৭। শরভঙ্গসুতীক্ষ্ণার্চ্চিত রাম
৩৮। অগস্ত্যানুগ্রহবর্দ্ধিত রাম
৩৯। গৃধ্রাধিপসংসেবিত রাম
৪০। পঞ্চবটীতটসুস্থিত রাম
৪১। শূর্পণখার্ত্তিবিধায়ক রাম
৪২। খরদূষণমুখসূদক রাম
৪৩। সীতাপ্রিয়হরিণানুগ রাম
৪৪। মারীচার্ত্তিকৃদাশুগ রাম
৪৫। বিমুষ্টসীতান্বেষক রাম
৪৬। গৃধ্রাধিপগতিদায়ক রাম
৪৭। শবরীদত্তফলাশন রাম
৪৮। কবন্ধবাহুচ্ছেদন রাম

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড :

৪৯। হনুমৎসেবিতনিজপদ রাম
৫০। নতসুগ্রীবাভীষ্টদ রাম
৫১। গাব্বতবালিসংহারক রাম
৫২। বানরদূতপ্রেষক রাম
৫৩। হিতকরলক্ষ্মণসংযুত রাম

সুন্দরকাণ্ড :

৫৪। কপিবরসন্ততসংস্মৃত রাম
৫৫। তদ্গতিবিঘ্নধ্বংসক রাম
৫৬। সীতাপ্রাণাধারক রাম
৫৭। দুষ্টদশাননদূষিত রাম
৫৮। শিষ্টহনুমদ্ভূষিত রাম
৫৯। সীতাবেদিতকাকাবন রাম
৬০। কৃতচূড়ামণিদর্শন রাম
৬১। কপিবরবচনাশ্বাসিত রাম

যুদ্ধকাণ্ড :

৬২। রাবণনিধনপ্রস্থিত	রাম	৬৩। বানরসৈন্যসমাবৃত	রাম
৬৪। শোষিতসরিদীশার্থিত	রাম	৬৫। বিভীষণাভয়দায়ক	রাম
৬৬। পর্ব্বতসেতুনিবন্ধক	রাম	৬৭। কুম্ভকর্ণশিরশ্ছেদক	রাম
৬৮। রাক্ষসসংঘবিমর্দ্দক	রাম	৬৯। অহিমহিরাবণচারণ	রাম
৭০। সংহৃতদশমুখরাবণ	রাম	৭১। বিধিভবমুখসুরসংস্তুত	রাম
৭২। খস্থিতদশরথবীক্ষিত	রাম	৭৩। সীতাদর্শনমোদিত	রাম
৭৪। অভিষিক্তবিভীষণনত	রাম	৭৫। পুষ্পকযানারোহণ	রাম
৭৬। ভাদ্বাজাভিনিষেবণ	রাম	৭৭। ভরতপ্রাণপ্রিয়কর	রাম
৭৮। সাকেতপুরীভূষণ	রাম	৭৯। সকলস্বীয়সমানত	রাম
৮০। রত্নলসৎপীঠাস্থিত	রাম	৮১। পট্টাভিষেকালঙ্কৃত	রাম
৮২। পার্থিবকুলসম্মানিত	রাম	৮৩। বিভীষণর্পিতরঙ্গক	রাম
৮৪। কীশকুলানুগ্রহকর	রাম	৮৫। সকলজীবসংরক্ষক	রাম
৮৬। সমস্তলোকাধারক	রাম		

উত্তরকাণ্ড :

৮৭। আগতমুনিগণসংস্তুত	রাম	৮৮। বিশ্রুতদশকণ্ঠোদ্ভব	রাম
৮৯। সীতালিঙ্গননির্বৃত	রাম	৯০। নীতিসুরক্ষিতজনপদ	রাম
৯১। বিপিনত্যাজিতজনকজ	রাম	৯২। কারিতলবণাসুরবধ	রাম
৯৩। স্বর্গতসম্বুকসংস্তুত	রাম	৯৪। স্বতনয়কুশলবনন্দিত	রাম
৯৫। অশ্বমেধক্রতুদীক্ষিত	রাম	৯৬। কালাবেদিতসুরপদ	রাম
৯৭। আযোধ্যকজনমুক্তিদ	রাম	৯৮। বিধিমুখবিবুধানন্দক	রাম
৯৯। তেজোময়নিজরূপক	রাম	১০০। সংসৃতিবন্ধবিমোচক	রাম

১০১। ধর্ম্মস্থাপনতৎপর রাম ১০২। ভক্তিপরায়ণমুক্তিদ রাম
১০৩। সর্ব্বচরাচরপালক রাম ১০৪। সর্ব্বভবাময়বারক রাম
১০৫। বৈকুণ্ঠালয়সংস্থিত রাম ১০৬। নিত্যানন্দপদস্থিত রাম
১০৭। রাম রাম জয় রাজা রাম ১০৮। রাম রাম জয় সীতা রাম

পিলু কাহার বা

** ভয়হর মঙ্গল দশরথ রাম জয় জয় মঙ্গল সীতা রাম
** মঙ্গলকর জয় মঙ্গল রাম সঙ্গতশুভবিভবোদয় রাম
** আনন্দামৃতবর্ষক রাম আশ্রিতবৎসল জয় জয় রাম
** রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিতপাবন সীতা রাম

স্তব ঃ

ভীম পলশ্রী—একতালা

কনকাম্বর কমলাসনজনকাখিল ধাম
সনকাদিকমুনিমানসসদনানঘ ভূম
শরণাগতসুরনায়কচিরকামিত কাম
ধরণীতলতরণদশরথনন্দন রাম
পিশিতাশনবনিতাবধজগদানন্দ রাম
কুশিকাত্মজমখরক্ষণচরিতাদ্ভুত রাম
মুনিগৌতমগৃহিণীস্বজদঘমোচন রাম
মুনিমণ্ডলবহুমানিতপদপাবন রাম
স্মরশাসনসুশরাসনলঘুভঞ্জন রাম
নরনির্জ্জরজনরঞ্জন সীতাপতি রাম

কুসুমায়ুধতনুসুন্দর কমলানন রাম
বসুমানিতভৃগুসম্ভব মদমর্দ্দন রাম
করুণারসবরুণালয় নতবৎসল রাম
শরণং তব চরণং ভব হরণং মম রাম

প্রণাম ঃ

ইমন-কল্যান

আপদামপহর্ত্তারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্।
লোকভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্ ॥১॥
রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥২॥
অতুলিতবলধামং স্বর্ণ শৈলাভদেহং
দনুজবনকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্।
সকলগুণনিধানং বানরাণামধীশং
রঘুপতিবরদূতং বাতজাতং নমামি ॥১॥
গোষ্পদীকৃতবারীশং মশকীকৃতরাক্ষসম্।
রামায়ণমহামালারত্নং বন্দেহনিলাত্মজম্ ॥২॥
অঞ্জনানন্দনং বীরং জানকীশোকনাশনম্।
কপীশমক্ষহন্তারং বন্দে লঙ্কাভয়ঙ্করম্ ॥৩॥
উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধোঃ সলিলং সলীলম্ যঃ শোকবহ্নিং জনকাত্মজায়াঃ।
আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কাম্ নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেয়ম্ ॥৪॥

মনোজবং মারুততুল্যবেগং জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং শ্রীরামদূতং শিরসা নামামি ॥৫॥
আঞ্জনেয়মতিপাটলাননং কাঞ্চনাদ্রিকমনীয়বিগ্রহম্।
পারিজাততরুমূলবাসিনং ভাবয়ামি পবমাননন্দনম্ ॥৬॥
যত্র যত্র রঘুনাথকীর্ত্তনং তত্র তত্র কৃতমস্তাকাঞ্জলিম্।
বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনং মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্ ॥৭॥
ইতি অষ্টোত্তরশতনামরামায়ণং সমাপ্তম্

হিন্দি গান

ইমনকল্যাণ—তেওরা

শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু ভজু মন, হরণ - ভব - ভয় - দারুণং।
নব - কঞ্জ - লোচন, কঞ্জ - মুখ, কর-কঞ্জ পদ:কঞ্জারুণং ॥
কন্দর্প অগণিত অমিত ছবি, নব-নীল নীরদ সুন্দরং।
পট পীত মানহুঁ তড়িত রুচি শুচি নৌমি জনক-সুতা-বরং ॥
ভজু দীনবন্ধু দিনেশ দানব - দৈত্য-বংশ - নিকন্দনং।
রঘুনন্দ আনন্দ - কন্দ কোশল - চন্দ দশরথ - নন্দনং ॥
শির মুকুট কুণ্ডল তিলক চারু উদার রঙ্গ-বিভূষণং।
আজানু - ভূজ শর - চাপ - ধর, সংগ্রাম-জিত-খর-দূষণং ॥
ইতি বদতি তুলসীদাস শঙ্কর - শেষ - মুনি - মন - রঞ্জনং।
মম হৃদয়-কঞ্জ নিবাস কুরু কামাদি - খল - দল - গঞ্জনং ॥

———

ওঁ

শিব বন্দনা

১। আদি ঈশ্বর বিশ্বেশ্বর নির্‌-গুন গুনময়।
গরল তোমার আভরন রনেদৈত্যজৈ।য় দুর্জ্জয়।
হে মঙ্গল ময় কল্পতরু নমামি তোমায়,
হে মঙ্গল ময় কল্পতরু নমামি তোমায়॥

২। বামে অশিম অঙ্গকান্তিতে পার্ব্বতী শোভাপায়।
প্রভু তোমায় পাদ দয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু মস্তকে লয়।
হে মঙ্গলময় কল্পতরু নমামি তোমায়,
হে মঙ্গলময় কল্পতরু নমামি তোমায়॥

৩। ফনিফনা শোভে শিরে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম কটিতে রয়।
তুমিই তো মস্তকে ধারণ করিলে মাত গঙ্গায়
হে মঙ্গলময় কল্প তরু নমামি তোমায়।
হে মঙ্গলময় কল্প তরু নমামি তোমায়॥

৪। ত্রিনয়ন শোভে মুখে কটিচন্দ্র হার মানি যায়
তোমার কপাল তট চন্দ্র কলায় অলঙ্কৃত হয়
হে মঙ্গল ময় কল্প তরু নমামি তোমায়
হে মঙ্গলম কল্প তরু নমামি তোমায়

৫। ধর্ম্মরাজাশ্রীত আদিগুরু যুদ্ধে গজরাজের দন্ত ধরিবায়
তুমি প্রমথ দিগের প্রভু সেবকগনের রক্ষক ময়

হে মঙ্গল ময় কল্প তরু নমামি,তোমায়।
হে মঙ্গল ময় কল্প তরু নমামি তোমায়॥

৬। গজাগুরের জ্ঞানদাতা ভবস্মরনে হয় কাম জয়।
বর, বান, শুল ও বিষান ধারণ কর তায়।
হে মঙ্গল ময় কল্প তরু নমামি তোমায়।
হে মঙ্গল ময় কল্প তরু নমামি তোমায়॥

৭। সৃষ্টি স্থিথি লয়-কারি ইন্দ্রমুকুট তবপদে শোভাপায়।
তুমি তো প্রভু ভক্ত ও সাধু জনেয় এক মাত্র আশ্রয়।
হে মঙ্গল ময় কল্প তরু নমামি তোমায়।
হে মঙ্গল ময় কল্প তরু নমামি তোমায়॥

৮। হে বিশ্ব—নাথ শম্ভু তব স্মরণে সংসার দুঃখ নাস হয়।
প্রভু তোমায় কৃপায় জন্ম মৃত্যু নিশ্চয় হয় জয়।
হে মঙ্গল ময় কল্প তরু নমামি তোমায়।
হে মঙ্গল ময় কল্প তরু নমামি তোমায়॥

ওঁ

মহাকালী বন্দনা

ওঁ কালী কালী মহাকালী
কালী করালী কৈবল্যদায়িনী
ওঁ সচিদানন্দ রূপিনী আনন্দময়ী
আনন্দদায়িনী নিরানন্দ নিবারণী
অভয়াদায়িনী ওঁ শক্তিদায়িনী নারায়ণী
তুমি মা সন্ধা তুমি মা গায়ত্রী তুমিই জগতধাত্রী
তুমিতো দুর্গতি নাশিনী দুর্গামাগো
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ
ওঁ নমো ভক্তি দায়িনী মহাকালীকে নমঃ

ওঁ নমঃ পার্ব্বতী পতে হর হর মহাদেব শম্ভো।
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ন বাসুদেব।
ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব। ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দব্রিনং ত্বমেব। ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব-দেব॥

গীত – আরত্রিক ভজন (বেলাবল)

ভববন্ধন হারি নররূপধারি বন্দনা তব করি নিরগুন গুন ময় হরি॥
তবনাম মহিমায় মহা পাপ হয় ক্ষয় তব প্রেম দানে বিশ্বেরশান্তি
আজি আরতি তোমারি প্রভু আরতি তোমারি॥
ইচ্ছাময় তব ইচ্ছায় মূর্খ হয় জ্ঞানী তবদৃষ্টিপাতে দূর হয় মহাব্যাধি,
আজি আতি তোমারি প্রভু আরতি তোমারি॥
হেবিবেক ভাস্কর ত্যাগিশ্বর যোগীবর লহ প্রণাম শিবের বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর।
নমোনমো নমঃ প্রভু আরতি তোমারি, শিব শিব শিব প্রভু আরতি তোমারি,
জয় জয় জয় প্রভু আরতি তোমারি, লহ লহ লহ প্রভু আরতি তোমারি॥

বাগেশ্বরী

আড়াল থেকে দেখছো মাগো ছেড়ে আমায় ভবসাগরে,
অতল জলে খাই হাবু ডুবু বসে আছ কেমন করে।
ভাবতে আমায় হতো নাকো একলা যদি পাঠাতে মোরে,
সঙ্গে দিলে ছয়পেয়াদা একা সামাই কেমন করে।
দিবারাতি করুণ সুরে জানাইতেছি মা তোমারে,
দয়াময়ী মাগো আমায় দেমা দেখা কৃপা করে।
শিব বলে "মা" শোন এবারে এতেও যদি পাই না সাড়া
আসরো যখন আবার পরে পাষানী বলে ডাকবোতোরে॥

ভৈরবী

ভবের ভেলকি দেখে প্রাণ গেল তবু গেল না জ্বালা।
প্রথমেতে বুঝিলেরে মন তালে সার করিতে নামের মালা
এখন গুরুর চরণ স্মরণ নিয়ে মন ঘুচাও ভবের জ্বালা ॥
(শিব বলে) তাই গুরু দত্ত ইষ্ট মন্ত্র জোপরে মন অবিশ্রান্ত,
হৃদি মাঝারের অতল জলে ভাসাও নামের ভেলা।

কাফি

মন আর কতদিনে ছুটিবেরে তোর ভবের মায়ার নেশা,
নেসার ঘোরে মাতাল হয়ে হারালি তুই সকল দিশা ॥
ও মন কার তরে তুই পুটুলি বেঁধে জমাচ্ছিসরে টাকা পয়সা,
আসিবে যখন কাল সমন তখন কি হবে তোর ঐ পুটুলির দশা ॥
অনিত্ব দেহ নিয়ে কিলোভে কোরছো সদাই মাজা ঘসা,
আপন জনে দিবে মুখে আগুন তুমি দেহ ছাড়বে যখন,
একবার ভেবে দেখ তখন তোমার দেহের কিবা হবে দশা,
সাজান সংসার পড়ে রবে ভাঙ্গবে তোর তাসের বাসা ॥
শিব বলে তাই লওরে স্মরণ গুরুর ঐ অভয় চরণ,
দিন থাকিতে ভেঙ্গেরে মন এ ভবের মায়ার নেসা।

কাফি সিন্ধ

নামাজী নামাজী জপি জাগাহি যোগী।
ভোগ বিন আউর কুছ নাহি জানে ভোগী ॥
রোদন করনে লাগি রোগী রহে জাগি।
যো দান করে আনন্দ মিলে ঐ হ্যায় ত্যাগী ॥

ভজ গুরু বিশ্বনাথ প্রভু হরিহর
ব্রহ্ম নারায়ণঃ হরে কৃষ্ণ হরে রাম

মোন হয় সাই—(তেয়ট)

কোথা গুরু বিশ্বপতি অগতির তুমি গতি,
না পেয়ে তব সঙ্গতি কাঁদিতেছে মোর প্রাণ।
কিবা দোশে দোশি আমি বলগো প্রভু তুমি,
তনয়ের পরে প্রভু সাজেনা তব মান অভিমান।
এই আশিষ কর আমারে দয়াময় দয়া করে,
সদাই গাহিতে পারি যেন তব গুণগান।
এস প্রভু কৃপা করে এ দীনের হৃদিমাঝারে,
তব দরশন বিনে নাহি রবে শিবের প্রাণ।

কীর্ত্তন

গুরু কৃপা যদি পেতে চাও ভবে, গুরু দত্ত নাম জপরে সবে।
যখনি জপিবে ইষ্ট নাম ভবে, গুরু শ্রীচরণ স্মরণ লইবে সবে॥
এ ভবে যা কিছু করিবে সবে, গুরুরি কার্য্য করিচ ভাবিবে।
গুরু বিনে গতি নাই এ ভবে, মনে প্রাণে সদাই স্মরণ রাখিবে॥
তুমি ত্রিলোকের যেখানে যাবে, গুরু বিনে সেথায় কিছু নাই পাবে।
জ্ঞানি, গুনি, মানি যারে স্মরিবে, গুরু সর্ব্বাগ্রে সকলেই বলিবে॥
মুনি, ঋষি, ইন্দ্রাদির মুখেতে শুনিবে, গুরু নাম সদাই জপিতে বলিবে।
দেবাদিদেব তোমায় পঞ্চমুখে কবে, গুরুরে পূজিলে মোর পুজা হবে॥
প্রভু এদীন মুখে কিবা কবে, এই আশিষ করগো শিবে।
মৃত্যুকালে তব শ্রীচরণ স্মরণে রবে, জানি তনয়ের গতি তুমিই করিবে।

কৃর্ত্তন—মিশ্র ভৈরব

আমার হলোনা হলোনা হলোনা প্রভু কিছুই তো করা হলোন,
এ জনম বোধহয় বিফলে গেল ভবের কোন কাজেই লাগিলো না।
প্রভুভবে কেন এলাম কোথা বা যাবো বুঝিতে কেন পারি না,
এ বিশ্ব মাঝেতে না পারি মিশিতে সাধিতে তব সাধনা।
দুঃখীর লাগি কাদেন এ হিয়া কেন এমন পাসান হলাল বলোনা,
কামনার বসে ছুটি দেশে দেশে তবুতঃ আশা মিটে না।
যখন ধ্যানেতে বসি অন্য চিন্তা আসি যাগে নিত্য নব কল্পনা.
দানবের লাগি রিপু কুল যাগি দেয় কেন বাঁধা বলো না।
তব কৃপা বিনে এ চঞ্চল মনে কেমনে তরিব বল না।
যতদিন যায় কেন এমন হয় জাগে নিত্য নব বাসনা,
ক্ষণেকের তরে মনে প্রাণে প্রভু তোমারে ডাকিতে পারি না।
কি করিতে এনু কি ভুল করিনু কিবা করি এখন বলনা,
আসিবার আশা এবার ঘুচিল বোধহয় বাসনা সাধ মিটিল না।
তাই কেঁদে হই সারা কেন রব প্রভু তব ঐ শ্রীচরণ ছাড়া.
কৃপা করে শিবে আশা দিয়ে প্রভু নিরাশা যেন কোরনা॥

বেহাগ

যার হাঁসি তারি বাঁশী আমি তারে ভালো বাসি।
তাইতে আমি দিবানিশি থাকি তার ধ্যানে বসি।
সে যে আমার আমি তার তাইতো তারে ভালোবাসি।
আশা যাওয়া বার বার যার কৃপায় হয় নিবার,
সর্ব্বভূতে স্থিতি যার আমি তারে ভালবাসি ভালবাসি॥

গুরু প্রণাম

১। ভব পারের কাণ্ডারি তুমি বিনে কেবা হরি,
তব শ্রীচরণে সদাই নমামি নমামি ॥

২। তুহুবহ্মা তুহু বিষ্ণু তুহু মহেশ্বর,
পরম বহ্মা তুহারি চরণে নমামি নমামি ॥

৩। অজ্ঞান অন্ধকার নাশি যে করিল জ্ঞানেতে স্থিতি,
যে জ্যোতির বারে বারে নমামি নমামি ॥

৪। অখণ্ড মণ্ডলকারে আছে যে বিশ্বের চরাচরে,
যার কৃপায় দেখিনু তারে তারে নমামি নমামি ॥

৫। যে এক সঙে বিরাজিছে এ বিশ্ব বহ্মাণ্ডেতে,
তাঁরে যে জানাল তাঁরে নমামি নমামি ॥

৬। ব্রহ্মসার পরাৎপর সেই চিন্ময়েরে,
যে জানাল তাঁরে সদাই নমামি নমামি ॥

৭। সর্বস্তুতি শিররত্ন শোভে যে চরণে,
সেই সূর্য্যসম বেদজ্ঞরে নমামি নমামি ॥

৮। বোমেতে শোভে যে কলানাদ বিন্দুরূপে,
সেই সচ্চিদানন্দ রূপিরে সমামি নমামি ॥

৯। যাহার স্মরণে হয় সর্ব জ্ঞানের উদহ,
সেই সর্ব্ব জ্ঞানাধারে নমামি নমামি ॥

১০। স্মৃতি যার বিশ্বমাঝে স্থাবরে জঙ্গমে,
সেই নির্ম্মল প্রসান্ত রূপিরে নমামি নমামি ॥

১১। যিনি ভক্তি মুক্তি দাতা তত্ত্বমালা বিভুষিতা,
সেই জ্ঞানাধারে সদাই নমামি নমামি ॥

১২। যে করিল ছিন্নমোর কর্ম্মবন্ধ পাস,
সেই আত্মজ্ঞান দাতারে নমামি নমামি ॥

১৩। যে চরণ স্মরণে সবে শ্রেষ্ঠ সম্পদ মিলে ভবে,
সেই চরণে বারে বারে নমামি নমামি ॥

১৪। যে চরণ পূজিলে মেলে শ্রেষ্ঠ তত্ত্বতপ
সেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানাধারে নমামি নমামি ॥

১৫। হৃদয়ের নাথ তুহু শীনাথ জগতনাথ,
আত্মরুপি দেবতা তুহারে নমামি নমামি ॥

১৬। আদিদেব তুহু অখণ্ড অনাদি প্রভু,
বিশ্বশেষ্ঠ বিশ্বগুরু তুহারে নমামি নমামি ॥

ওঁ তৎ সৎ

বিশ্বমাঝে আছে খাঁটি
রাম নাম আর গঙ্গামাটি

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

পরমারাধ্য গুরুদেব পরমহংস শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ বাবার চরিতামৃত প্রকাশ হইল। সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িল যাঁহাদের কৃপায় এ দেহ পাইয়াছি। তাঁহারা যেখানেই থাকুন সর্ব্বাগ্রে সেই পূজনীয় পিতাঠাকুর ও পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীর চরণ স্মরণ করিয়া কোটি কোটি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইতেছি।

এই পুস্তিকা প্রকাশে যাহারা আমাকে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন ও দোষ গুণ বিচার করিয়া সংশোধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া সাধ্যমত সর্বাঙ্গ সুন্দর করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে না পারিলে আমার জীবনে শান্তি আসিতে পারে না।

যথাঃ— ১। শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ ২। সঙ্গীতাচার্য্য অমরনাথ ভট্টাচার্য্য ৩। শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ঘোষ। শ্রীদীনেশ চন্দ্র গাঙ্গুলী ৫। শ্রীশীতল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৬। শ্রীশ্রীশ চন্দ্র আচার্য্য ৭। জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ৮। শ্রীমতী অনিমা দে ৯। শ্রীসুধীব কুমার ঘোষ।

বিশেষত এই পুস্তিকা প্রেসে পাঠাইবার পূর্ব্বে শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দ পুরী মহারাজ তাহার অদ্বৈত আশ্রমের শত শত কার্য্য থাকা সত্ত্বেও দোষগুণ বিচার করিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। ও তাহার পরামর্শ মত এই পুস্তিকা ছাপাইতে দিয়া আমি বৃন্দাবনে যাই। ঐ সময় প্রেসের যাবতীয় কার্য্য দেখাশুনা করিবার ও ছাপার সংশোধন ইত্যাদি ভার (১) শ্রীপ্রসাদ দাস চক্রবর্ত্তী ২। শ্রীকৃষ্ণ কুমার দে ৩। শ্রীচন্দ্র শেখর সরকারের উপর ন্যাস্ত করিয়া শ্রীবিন্দাবন ইত্যাদি ঘুরিয়া কাশীতে আসি ও পুস্তিকা বাহির হইবার সময় কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় আসি। উক্ত তিন জন তাহাদের নানারূপ কার্য্যে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও প্রেসের যাবতীয় কার্য্য সমাধান করার জন্য তাহাদের কাছে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ রহিলাম। —গ্রন্থকার

হে মানব বহুজন্মের সাধনার পর এই দুর্লভ দেহ পাইয়াছ, এ দেহ চিরস্থায়ী নয়, ক্ষণস্থায়ী ধন, যৌবন ও জীবন লইয়া যত শীঘ্র পার মিত্রবৎ শত্রুদের মায়ার কবল হইতে সময় থাকিতে নিজেকে মুক্ত করিয়া একবার ভাবিয়া দেখ তুমি কে ? যতই পাপ কর না কেন, দিনান্তে একবার মনেপ্রাণে সেই পতিত পাবন বিশ্বনাথের স্মরণ লও। সদাই স্মরণ থাকে যেন তুমি স্বয়ং শিব। তাই বলি দিনান্তে কয়েক মুহূর্তের জন্য মন হইতে বিশ্বের সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়া শিবোহং শিবোহং শিবোহং এই মহা মন্ত্র জপ কর ॥

—গ্রন্থকার

প্রাপ্তিস্থান

হরিহর বিশ্বনাথ আশ্রম—অসিঘাট, বারানসী।

শিবগুরু হরিহর ভবন—আউং গব্বী, বারানসী।

শ্রীশীতল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য—১৬৭বি শ্যামা প্রসাদ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

ইন্টালী রামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়—৩৯. দেব লেন, কলিকাতা-১৪।

মাঙ্গলিক—৩বি, ডিহি ইন্টালী রোড, কলিকাতা-১৪।

প্রকাশক—৬২ ডাক্তার সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা-১৪।